আমাদের

বিদ্যাসাগর

মণি বাগচি

শরৎ পুস্তকালয়
৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

—মূল্য দুই টাকা মাত্র

য়ে • বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে • বেঁচে থা

আমাদের বিদ্যাসাগর

হয়ে • বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে • বেঁচে

বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে • বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে • বেঁচে থাক

॥ এক ॥

কার সাহেব খাঁটি ইংরেজ। হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি। যেমন বিদ্বান তেমনি দাম্ভিক! ভারতবাসীকে 'নেটিভ' ছাড়া বলেন না। শিষ্টাচারের ধার ধারেন না। কোনো দেশীয় মানী লোক তাঁর কাছে যদি কোনো বিষয়ে দেখা করতে যেতেন তাহলে কার সাহেব তাঁকে খুব বেশী খাতির করতেন না। পৃথিবীতে একমাত্র ইংরেজ ছাড়া আর সব অমানুষ—এই ছিল তাঁর ধারণা। এ হেন কার সাহেবকে একদিন কি একটা ব্যাপারে আসতে হলো সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে। সহকারী সম্পাদক একজন টুলো বামুন পণ্ডিত। কার সাহেব আসছেন শুনে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক তটস্থ হলেন, কিন্তু সহকারী সম্পাদকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই! অথচ সাহেবের দরকার তাঁর সঙ্গেই, তাই সাহেব সোজা তাঁরই অপিস ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের মধ্যে ছিল শুধু একখানা টেবিল আর একখানা চেয়ার! দ্বিতীয় চেয়ার নেই যে সাহেব বসবেন। সাহেব তাই ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর যখন দেখলেন যে, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সেই পণ্ডিত তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে তো দাঁড়ালেনই না, বরং দিব্যি টেবিলের ওপর পা দুটি তুলে দিয়ে হুঁকো টানছেন একমনে। সাহেব যে ঘরে ঢুকেছেন তা তাঁর খেয়ালই নেই। কার সাহেব চমকে উঠলেন, মনের মধ্যে ধাক্কাও খেলেন একটু। একজন নেটিভ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে এই রকম অভদ্র আচরণ করতে পারে—এ যেন তাঁর ধারণাই ছিল না। যাই হোক, কার সাহেব পণ্ডিতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেলেন। রাগে তখন তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ফিরে এসেই নালিশ করলেন ওপরওয়ালার কাছে। ওপরওয়ালাও এক সাহেব। তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

নির্ভীক পণ্ডিত তাঁর এই রকম ব্যবহারের জন্যে যে কৈফিয়ৎ

দিলেন, তা ভারি চমৎকার। তিনি বললেন—"এই রকম ব্যবহার তো সাহেবের কাছেই শিখেছি। আমাদের দেশের নিয়ম অন্য রকমের। শিষ্টাচার আমরা খুব ভালো করেই জানি, কিন্তু সেদিন আমি যখন একটা কাজে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন গিয়ে দেখি সাহেব টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চুরুট ফুঁকছেন। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, সাহেব আমাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। আমি মনে করলাম কোনো লোককে অভ্যর্থনা করতে হলে ঐ রকমই বুঝি করতে হয়! এইটেই বুঝি বিলিতি কায়দা। সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমিও তাই করেছি। কাজেই এতে আমার এতটুকু দোষ হয়েছে বলে আমি মনে করিনি।"

পণ্ডিতের এই কৈফিয়ৎ পাঠিয়ে দেওয়া হলো কার সাহেবের কাছে। সেই সঙ্গে তাঁর ওপরওয়ালা একটু মন্তব্যও পাঠালেন—"এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?"

কার সাহেব কৈফিয়তটা মন দিয়ে পড়লেন। বুঝলেন তিনি খুব সোজা লোকের পাল্লায় পড়েন নি! যাকে একজন নিরীহ টুলো পণ্ডিত বলে মনে করেছিলেন, তিনি যে এমন একজন নির্ভীক চরিত্রের মানুষ, সাহেব তখন তা বুঝতে পারলেন। এতেই তিনি খুব শিক্ষা পেলেন। ওপরওয়ালাকে লিখে পাঠালেন—"পণ্ডিতের কৈফিয়ৎ ঠিক। অন্যায়টা আমারই হয়েছে। আমি এর জন্যে দুঃখিত। সত্যিই তো শিষ্টাচার আমিই প্রথমে দেখাতে পারিনি।"

এই নির্ভীক টুলো পণ্ডিতই আমাদের বিদ্যাসাগর।

বাঙালির চিরকালের গর্ব ও গৌরব—সেই মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আজ থেকে একশো সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা।

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক অতি দরিদ্র বামুনের ঘরে একদিন দুপুর বেলায় শাঁখ বেজে উঠল! সেই শঙ্খধ্বনি জানিয়ে

দিল এক মহামানবের আবির্ভাব। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। হাটবার। ঠাকুরদাস হাটে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরছেন এমন সময় রামজয় তর্কভূষণ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন—"ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।"

ঠাকুরদাস পিতার রহস্য বুঝতে পারলেন না। তিনি তাই বাড়িতে ঢুকেই গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন—এঁড়ে বাছুরটিকে দেখবার জন্যে।

রামজয় হেকে বললেন—"ওদিকে নয়, এদিকে এসো।"

এই বলে তাঁকে আঁতুড় ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি শিশুকে দেখিয়ে বললেন—"এই দেখ এঁড়ে বাছুর। আমি বলে রাখছি, এ-ছেলে ভীষণ একগুঁয়ে হবে কিন্তু আমার বংশের মুখ রাখবে।"

দৈববাণীর মতো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল এই কথা। শিশু শুধু তাঁর বংশের মুখ রাখেন নি—তিনি উত্তরকালে সারা বাংলা দেশের মুখ রেখে ছিলেন। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগরের জন্মের শুভলগ্নে বিধাতা তাঁর ললাটে কি এঁকে দিয়েছিলেন, তা তিনিই জানতেন; কিন্তু তাঁর ঠাকুরদা রামজয় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বীরসিংহের এই পর্ণকুটীরে দরিদ্র বামুনের ঘরে আজ যে ছেলেটি জন্মালো সে ছেলে অসাধারণ হবেই।

অসাধারণ সত্যিই তিনি হয়েছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। বর্ণ-পরিচয় লেখা থেকে শুরু করে বিধবার বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত, সকল কাজে দেশবাসী তাঁর অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন। সেদিন বাংলাদেশে এই একটি মানুষই ছিলেন, যাঁর চরিত্র, কর্ম আর ব্যবহার কালের পটে চিরন্তন হয়ে আছে। শুধু বীরসিংহের রামজয় তর্কভূষণের ঘরে নয়, সেদিন সমগ্র বাংলা দেশেই দরকার হয়েছিল এমনি একজন অসাধারণ মানুষের, যাঁর তেজস্বিতা আর বেদনাবোধ বাঙালিকে মনুষ্যত্বের ধর্মে নতুন করে দীক্ষা দিতে পারত। তাই দেশের প্রয়োজনে, ইতিহাসের প্রয়োজনে সেদিন এক শুভ লগ্নে জন্মালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

॥ দুই ॥

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুর গ্রাম।

সেই গ্রামে বাস করেন একঘর বামুন-পণ্ডিত। তাঁদের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। একান্নবর্তী পরিবার। বাঁড়ুয্যেরা পাঁচ ভাই। সেজ ভাইয়ের নাম রামজয় তর্কভূষণ। দুর্গাদেবী তাঁর স্ত্রী। বড় আর মেজ ভাইয়ের ওপর ছিল সংসারের ভার। রামজয় ছিলেন মহা তেজস্বী। কারো খোসামোদ করা তাঁর স্বভাবের ধর্ম ছিল না। কোনো রকমের অন্যায় আচরণ তিনি সইতে পারতেন না। তাছাড়া অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন এই রামজয়। সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটি তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু একান্নবর্তী সংসারে একটানা শান্তি সম্ভব নয়—বিশেষ করে ভাইদের উপার্জনের ওপর যখন কাউকে নির্ভর করে থাকতে হয়, তখন তাঁর পক্ষে অন্য ভাইদের কাছ থেকে দুই-একটা শক্ত কথা শুনতেই হয়। রামজয়ের দুই ছেলে আর চার মেয়ে, সবাই ছোট। বড় ছেলেটির নাম ঠাকুরদাস। তাঁর বয়স তখন মাত্র দশ বছর।

দিন যায়। ক্রমে সংসারে অশান্তি বাড়ে।

দুর্গাদেবীকে সহ্য করতে হয় আর সব ভাজদের গঞ্জনা। কারণ তাঁর স্বামী তো আর কিছুই রোজগার করেন না! ক্রমে অন্য ভাইদের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মতান্তর হলো রামজয়ের। সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হলেন তিনি। ঠিক করলেন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও চলে যাবেন। একদিন সত্যি সত্যি রামজয়কে আর বনমালীপুরে দেখতে পাওয়া গেল না। এক মাস দু'মাস করে ছ'মাস কেটে গেল, কিন্তু রামজয়ের আর কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। এখন দুর্গাদেবীর পক্ষে এ-সংসারে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। ভাজদের দুর্ব্যবহার চরমে উঠল। শেষ পর্যন্ত দুর্গাদেবী স্বামীর ভিটেয় থাকতে না পেরে বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে।

রামজয় তর্কভূষণ যেমন তেজস্বী ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর গায়ের জোর আর সাহস। সে সময়ে বনমালীপুরে তাঁর মতো সাহসী আর শক্তিমান পুরুষ খুব কমই ছিল। তিনি বাঘ-ভালুকের সামনে পর্যন্ত যেতে ভয় পেতেন না।

একবার তিনি বীরসিংহ গ্রাম থেকে মেদিনীপুরে যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে এ-অঞ্চলের পথ-ঘাট খুব নিরাপদ ছিল না। পথের দু'পাশেই গভীর বন-জঙ্গল। কত হিংস্র জন্তু সেই অরণ্যে। রামজয় চলেছেন একমনে। হাতে একটা লোহার লাঠি। এই লাঠি সম্বল করেই তিনি চলাফেরা করতেন। হঠাৎ তাঁর সামনে একটা ভালুককে দেখতে পেয়েই তিনি দাঁড়ালেন একটা গাছের আড়ালে।

ভালুক তখন মানুষের গন্ধ পেয়েছে—সেও ছাড়বার পাত্র নয়। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গাছের কাছে এসে দাঁড়াল সেই বিরাট লোমশ জীবটি। গাছটার দুদিক দিয়ে হাত বাড়ালো শিকারকে ধরবার জন্যে। যেই হাত বাড়ানো, রামজয় অমনি তার হাত দুটো দুদিক থেকে দু'হাতে খুব শক্ত করে ধরলেন আর গাছের গায়ে প্রাণপণ শক্তিতে ঘষড়াতে লাগলেন। ঘষড়ানির চোটে ভালুকের অবস্থা হলো কাহিল—কিছুক্ষণ পরে সে একেবারে চিৎপাৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রামজয় মনে করলেন ভালুকটা মরে গেছে। তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে আবার পথ চলতে আরম্ভ করলেন। যেই দু-এক পা এগিয়েছেন, অমনি ভালুকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে তাঁকে থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরলো। থাবার ধারাল নখগুলো তাঁর গায়ে বসে গেল; কিন্তু রামজয়ের হাতে ছিল লোহার লাঠি। তাই দিয়ে তিনি ভালুকটার নাকের ওপরে বসিয়ে দিলেন জোরে এক ঘা। সেই প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ভালুকটা ঘুরে পড়ে গেল। তার ওপর আরো কয়েক ঘা পড়ল। এবার ভালুকটা মরেই গেল। কিন্তু ভালুকের নখের সেই চিহ্ন রামজয়ের শরীরে ছিল।

তখন ঐ অঞ্চলে অনেক ডাকাত বাস করতো। দিনে-দুপুরে

কোনো লোক যদি একলা পথ দিয়ে হাঁটতো আর দৈবক্রমে যদি সে কোনো ডাকাতের কবলে পড়তো, তাহলে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। কিন্তু রামজয় তাঁর লোহার লাঠি সম্বল করে একাকী নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন। ডাকাতদের সাধ্য ছিল না এই বামুনের কেশাগ্র স্পর্শ করে। রামজয়ের ভয়ে ডাকাতরা পর্যন্ত তটস্থ থাকতো।

পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এই অমিত সাহস, শক্তি আর তেজস্বিতা।

স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হবার মাস ছয়েক বাদেই দুর্গাদেবী চলে এলেন বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ীতে। ভাবলেন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে একটু আদর-যত্ন পাবেন। প্রথম প্রথম অবশ্য তিনি আদর-যত্ন পেলেন। কিন্তু তাঁর বাপের বাড়ীর সংসারে কর্তা তখন ভাই আর ভাই-বৌ। দুদিন বাদেই দুর্গাদেবীকে তাঁরা উঠতে বসতে কথা শোনাতে লাগলেন। মুখ বুঁজে সহ্য করেন দুর্গাদেবী। স্বামী যাঁর নিরুদ্দিষ্ট, যাঁকে ছ'টি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে হবে, তাঁর পক্ষে সবই মুখ বুঁজে সইতে হয়। কিন্তু বাপের বাড়ীতে এই অনাদর ও উপেক্ষা যখন চরমে উঠল তখন দুর্গাদেবী একদিন তাঁর বাবাকে বললেন—"বাবা, তুমি এখন বুড়ো হয়েছ, এ-সংসারে তোমার কোন কথাও এখন খাটে না। তাই আমারও এখানে আর থাকা চলবে না।"

"তাহলে কোথায় যাবি তুই?"—জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ তর্কসিদ্ধান্ত।

"সামনের ঐ জায়গাটায় আমার থাকবার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর তুলে দাও।"

"তা না হয় দিলাম, কিন্তু খাবি কি? একা হলে না হয় ভাবনা-চিন্তা ছিল না।"

"চরকায় সূতো কেটে খাব।"

শেষে তাই হলো। চরকায় সূতো কেটে দিনাতিপাত করেন দুর্গাদেবী। কারো সাহায্য তিনি নেবেন না। স্বামীর মতই তাঁর মনের দুর্জয় বল। পরের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করার চেয়ে বিড়ম্বনার আর কিছু নেই। স্বামী একদিন নিশ্চয়ই ফিরবেন—এই বিশ্বাস ছিল দুর্গাদেবীর। এই বিশ্বাসেই তিনি বুকে বল বেঁধে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেই পর্ণকুটীরে একাকিনী বাস করতে লাগলেন। ঠাকুরদাস মায়ের কষ্ট দেখেন আর ভাবেন কি করলে মায়ের দুঃখ লাঘব করা যায়। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। ঠাকুর-দাসের বয়স তখন পনের বছর। একদিন তিনি দুর্গাদেবীকে বললেন—"মা, আমি কলকাতায় যাই।"

"সেখানে গিয়ে কি করবি?"

"চাকরী করব! তোমার এই কষ্ট আর দেখতে পারি না। আমি তো এখন বেশ বড় হয়েছি।"

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন, কিন্তু চোখে তাঁর আসে জল।

ঠাকুরদাস বলেন—"ভাই বোনদেরও তো মানুষ করতে হবে, মা! আমি কলকাতায় যাই। তুমি মত দাও।"

দুর্গাদেবীর কত সাধ ছিল। তাঁর স্বামী কত বড় পণ্ডিত, তাঁর ছেলেকেও তিনি তেমনি পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে, যে বয়সে ছেলের লেখা পড়ার সময়, সেই বয়সে ওকে চাকরীর জন্য যেতে হচ্ছে কলকাতায়। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদেবী মত দিলেন। একদিন শুভদিনে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা রওনা হলেন।

শহর কলকাতা। তখনও পুরো শহর হয়ে ওঠেনি।

ঠাকুরদাস এলেন সেই শহরে চাকরীর খোঁজে। উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। কিন্তু একটু ইংরাজী না জানলে কি করে চাকরী হয়? তাঁর বিদ্যে তো ব্যাকরণ পর্যন্ত। তখন সবে এ-দেশে ইংরেজী লেখাপড়া শুরু হয়েছে। বড়লোকের

ছেলেরা ভিন্ন কেউ ইংরেজী শিখতে পারত না। সবাই বলেন, ইংরেজী শিখতে পারলে সাহেবদের অফিসে ভালো চাকরী জুটতে পারে। কিন্তু কি করে ইংরেজী শেখা যায়? যে আত্মীয়ের বাড়ী থাকতেন তাঁকে ধরলেন ঠাকুরদাস। তাঁর জানাশুনা এক ভদ্রলোক অল্পবিস্তর ইংরেজী জানতেন। তাঁর কাছেই ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ভদ্রলোক থাকতেন একটু দূরে। তার ওপর সন্ধ্যে ছাড়া তাঁর সময় নেই। ঠাকুরদাস রোজ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ইংরেজী শিখতে লাগলেন। বাসায় ফিরতে রাত হয়ে যেতো। কাজেই প্রায় প্রতি রাত্রেই তাঁকে উপোস করে কাটাতে হতো।

তা হোক! তবু ইংরেজী শিখতে হবে। চাকরী একটা জোটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের চোখে ভেসে উঠলো বীরসিংহ গ্রামের সেই ছোট্ট কুটীরখানির কথা, যেখানে তাঁর দুঃখিনী মা চরকায় সুতো কাটছেন, যেখানে রয়েছে তাঁর ছোট্ট ভাইবোনগুলি। কখনো কখনো এমন হতো যে, সমস্ত দিনই তাঁর অন্ন জুটত না। তাতেও ঠাকুরদাসের ভ্রূক্ষেপ নেই। মুড়ী মুড়কী খেয়ে, কখন বা রাস্তায় জল খেয়ে তিনি দিন কাটাতেন। এইরকম কষ্ট করে কিছু ইংরেজী শিখে, ঠাকুরদাস দু'টাকা মাইনের একটা চাকরী পেলেন।

ছেলের চাকরী হয়েছে শুনে দুর্গাদেবীর সে কি আনন্দ! দুঃখের সংসারে বুঝি সুদিন এলো। মন ঢেলে কাজ করেন ঠাকুরদাস। মনিব সন্তুষ্ট হয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেন। তাঁর বয়স যখন বাইশ-তেইশ বছর, তখন ঠাকুরদাসের মাইনে আট টাকা হলো। তখনকার দিনে এই আট টাকার অনেক দাম ছিল। নিজের জন্যে অল্প কিছু রেখে বাকী টাকা তিনি মাকে পাঠিয়ে দিতেন। ঠিক এমনি সুদিনেই নিরুদ্দিষ্ট রামজয় একদিন হঠাৎ দেশে ফিরলেন।

॥ তিন ॥

দেশে ফিরে রামজয় শুনলেন দুর্গাদেবী বনমালীপুরের বাড়িতে নেই।

এলেন তিনি বীরসিংহ গ্রামে তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে। সেখানেও দুর্গাদেবী নেই। তারপর সন্ধান পেলেন এক পর্ণকুটীরের। সাধ্বী স্ত্রীর এই স্বাধীন-চিত্ততা দেখে রামজয় অবাক হলেন। যখন ভাইদের গুণের কথা সব শুনতে পেলেন তখন তিনি আর বনমালীপুরের পৈতৃক ভিটেয় ফিরে যেতে চাইলেন না। বীরসিংহ গ্রামেই থেকে গেলেন। রামজয় তর্কভূষণ গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল অতি মহৎ। কিছুতেই কারো অনাদর বা অপমান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। উপকার লাভের আশায় কারো খোসামোদ করা তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। নিজে যা ভালো বুঝতেন, তাই করতেন। কথায় কথায় মত বদলাতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তিনি, কিন্তু ধনীর অনুগ্রহ রামজয় একেবারেই পছন্দ করতেন না। অত্যন্ত সত্যবাদী মানুষ। কেউ রাগ করবে বা অসন্তুষ্ট হবে বলে স্পষ্ট কথা বলতে তিনি ভয় পেতেন না। বড়লোক, টাকা আছে কিন্তু ব্যবহারে আদৌ ভদ্র নয়, এমন লোককে রামজয় একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমাদের বিদ্যাসাগর তাঁর ঠাকুরদার এইসব গুণই পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন।

একদিন বীরসিংহের এক জমিদার রামজয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেই জমিদার তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কথায় কথায় একদিন বললেন—"ঠাকুর, আমার খুব ইচ্ছা যে, আপনাকে কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দিই।"

"জমি নিয়ে কি করব?"—বললেন নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ।

"সেই জমিতে একখানা আটচালা তুলে বাস করবেন। এই একখানা ঘরে আর এতটুকু জায়গাতে আপনার তো আর এখন কুলোয় না।"

"না, তা কুলোয় না। তাই বলে কারো দান আমি নিতে পারি না। ছেলেরা বড় হলে যদি পারে তখন করবে।"

সেই জমিদার কত সাধ্যসাধনা করলেন, আত্মীয় স্বজনেরা কত পরামর্শ দিল, কিন্তু রামজয়ের সেই এক কথা—কারো দান আমি নিতে পারি না।

বীরসিংহ গ্রামে কিছুদিন কাটিয়ে রামজয় এলেন কলকাতায় ছেলেকে দেখবার জন্যে।

এসে দেখেন ঠাকুরদাস নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান আর অতি কষ্টে থাকেন। এইভাবে তিনি এই বয়সে সংসারের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন। ঠাকুরদাস যেখানে থাকতেন, সেই বাড়ির কর্তার কাছে রামজয় শুনলেন তাঁর ছেলের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা, শুনলেন তাঁর অন্যান্য গুণের কথা। পুত্রগর্বে ভরে ওঠে পিতার বুক। কিন্তু এইভাবে থাকলে ঠাকুরদাসের শরীর টিকবে না। মনে পড়ে গেল বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের কথা। ভাগবতচরণ যেমন দয়ালু তেমনি ধার্মিক ছিলেন। তিনি রামজয়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। শেষ পর্যন্ত রামজয় সিংহ মশাইয়ের বাড়িতেই ছেলেকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে এসে থাকতে লাগলেন রামজয়। খাওয়া দাওয়ার সুবিধে তো হলোই, তার ওপর সিংহ মশাইয়ের চেষ্টায় ঠাকুরদাসের একটা ভালো কাজও জুটে গেল। মাইনে হলো দশ টাকা। ছেলের মাইনে বেড়েছে শুনে দুর্গাদেবীর অনন্দের সীমা রইল না! একদিন তিনি স্বামীকে বললেন—"ছেলের এখন বয়স হয়েছে। এইবার ঠাকুরদাসের বিয়ে দিয়ে একটা বৌ ঘরে নিয়ে এসো।" ঠাকুরদাসের বয়স তখন চব্বিশ বছর।

রামজয় বললেন—"বেশ, ভালো কথা! আমি মেয়ে দেখছি।"

তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর গোঘাটে রামকান্ত তর্ক-বাগীশের একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। নাম ভগবতী। রূপ যেমন, গুণেও তেমনি। রামজয়ের খুব পছন্দ হলো। মেয়ের

বাপও খুব ভালো লোক। দুর্গাদেবীকে এসে বললেন সব কথা। শুনে দুর্গাদেবীও রাজী হলেন। বিয়ের দিন ঠিক করে কলকাতায় ঠাকুরদাসকে চিঠি লিখে দিলেন রামজয়। তারপর একদিন শুভ-দিনে ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিয়ে হলো।

এই ভগবতী দেবীই আমাদের বিদ্যাসাগরের মা।

মায়ের মতো মা ছিলেন ভগবতী দেবী। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জননী সকল দিক দিয়েই একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।...ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করার কথা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল।"

ছোটবেলা থেকেই ভগবতী দেবী শান্তশিষ্ট ও ধীর ছিলেন। মুখশ্রী ছিল তাঁর অতীব সুন্দর, হৃদয়ের উদারতা আর স্নেহ ছিল গভীর। সমস্ত মুখখানা ভরে ছিল একটা সুসংযত মহিমাময় সৌন্দর্য। সূর্যের আলো যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, কোনো বাধা মানে না, ভগবতী দেবীর অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্য তেমনি চারিদিকে বিকীর্ণ হতো, সে-দয়া মনুষ্যের মধ্যে ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় জ্ঞান করতো না। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমদৃষ্টি। শুধু কি দয়া-দাক্ষিণ্য ? বুদ্ধি, তেজ প্রভৃতি সব সদ্‌গুণই এই মহীয়সী নারীর মধ্যে সমভাবে বিকাশ করেছিল। বীরসিংহের সকলেই ভগবতী দেবীর প্রশংসা করতো। পুত্রবধূর মধ্যে এইসব বিবিধ গুণের সমাবেশ দেখে রামজয় মাঝে মাঝে দুর্গাদেবীকে বলতেন—"কেমন লক্ষ্মীর মতো বৌ এনেছি, বলো ?"

দুর্গাদেবী সায় দিতেন।

ছেলের এখন রোজগার হয়েছে, সংসারে লক্ষ্মীর মতো বৌ এসেছে, দেখতে দেখতে রামজয়ের সংসারের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে গেল।

তারপর একদিন যখন দরিদ্রের পর্ণকুটীর আলো করে জন্মালেন ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর, সেদিন দুর্গাদেবীর আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হলো। নাতির জন্মের সময়ই রামজয় দুর্গাদেবীকে বললেন—"দেখে নিয়ো, এই ছেলে থেকেই আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।"

পিতামহের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। বিদ্যাসাগর শুধু তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল করেন নি—তিনি সারা বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। গরীবের ঘরে জন্মালে কি হয়, অমন ঋষির মতো ঠাকুরদা, অমন পুণ্যবতী ঠাকুরমা আর অমন দয়াবতী যাঁর মা—তাঁর চরিত্রে এঁদের সকলের গুণই এসে জড়ো হয়েছিল। অমন দয়াময়ী জননীর সন্তান হয়ে জন্মেছিলেন বলেই না বিদ্যাসাগর দয়ারসাগর হতে পেরেছিলেন।

শুধু কি দয়ার সাগর? অশেষ গুণের সাগর ছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, চরিত্র, পরোপকার, ত্যাগ, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ গুণের সমাবেশ হয়েছিল এই একটি মানুষের মধ্যে। তাই না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম।

॥ চার ॥

রামজয় পৌত্রের নাম রাখলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বড় অদ্ভুত নাম। বীরসিংহের একজন মাতব্বর একদিন এসে বললেন—"ঠাকুর মশাই, নাতির একি বিদ্‌ঘুটে নাম রাখলেন?"

"কেন, ঈশ্বর নাম কি খারাপ?"

"না, তা নয়! তবে ঈশ্বর মানে তো ভগবান!"

"দেখো তো, ব্যাটাদের একেবারে বুদ্ধি নেই। আমার নাতি ভগবানের মতই দয়ালু হবে, তাঁর মতো তেজা হবে, তাঁর মতো ক্ষণজন্মা হবে, এ-সব জেনেই তো এই নাম রেখেছি।"

"আর নামের সঙ্গে ঐ যে চাঁদ যোগ করেছেন?"

"হ্যাঁ! চাঁদ দেখিস নি? চাঁদের আলো দেখিস নি? দেখিস, আমার নাতির যশের আলো চাঁদের আলোর মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।"

মাতব্বর আর তর্ক করলেন না। চলে গেলেন তিনি। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দুর্গাদেবী। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন—"কি গো তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?"

"তার মানে?"

"এই যে সকলের কাছেই কি সব বলে বেড়াচ্ছ, আমার নাতি হেন হবে, তেন হবে। তা নাতি বড় হোকই আগে, তারপর—"

"কি বলছ গিন্নী? আমার তীর্থের স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।"

"স্বপ্নের কথা কি বলছ তুমি।"—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন দুর্গাদেবী।

"ওঃ! তোমাকে বলিনি বুঝি! সেই যে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম, তখন কেদার পাহাড়ে ঘুমের ঘোরে এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখালাম যে, আমাদের বংশে একজন মহাপুরুষ জন্মাবেন, তাই না আমি ফিরে এলাম আবার।"

"তাই ফিরে এলে বুঝি? ভাগ্যিস স্বপ্ন দেখেছিলে!"—হেসে বলেন দুর্গাদেবী।

"ঠাট্টা করছ বুঝি। আমি জ্যোতিষীকে দিয়ে গুণিয়ে দেখেছি, এ-ছেলে ক্ষণজন্মা না হয়ে যায় না।"

"তবে সেদিন যে বললে এঁড়ের মতো জেদী হবে এই ছেলে।"

"হবেই তো! জেদ-ই তো বড়লোকের লক্ষণ।"

দুর্গাদেবী নিরস্ত হলেন।

বীরসিংহের সকল লোকের মুখেই একটি কথা—ঈশ্বর!

দুরন্ত দামাল ছেলে, তবু সবাই ভালোবাসে তাকে। বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সব সময় এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়ায়। নয়তো ঠাকুরদার কোলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে ঈশ্বর পাঁচ বছরের হলো। এইবার হাতে খড়ি দিতে হবে। স্নেহে যেমন, শাসনেও তেমনি কঠিন তাঁর পিতামহ। পাঁচ বছর হতেই তিনি নাতির পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন পাড়াগাঁয়ে স্কুল ছিল না, ইংরেজী তো পড়ানো হতোই না। তখন শুধু ছিল পাঠশালা। পাঠশালায় পড়ানো হতো শুধু বাংলা। মাষ্টার একজন। তাঁকে বলা হতো গুরুমশাই। বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত গুরুমশাই-এর একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় ভর্তি হলেন বালক ঈশ্বরচন্দ্র। একটি খড়ের চালায় সেই পাঠশালা। পড়ুয়ারা সব মেঝেতে বসে পড়ত। মাঝখানে বসতেন গুরুমশাই। মাটিতে রাম খড়ি দিয়ে দাগ কেটে কেটে লেখা শেখানো হতো। নাতিকে ভর্তি করে দিয়ে যাবার সময়ে রামজয় গুরুমশাইকে বললেন—"দেখো কালীকান্ত, ছেলেটার দিকে একটু নজর দিয়ো। বড় জেদী আর একটু দুষ্টুও বটে। তবে বুদ্ধি খুব প্রখর।"

"আজ্ঞে আপনার নাতি বুদ্ধিমান হবে না তো কে হবে?"

"একটু যত্ন নিও ছেলেটার উপর, বুঝলে?"

"আজ্ঞে তা নেবো বই কি!"

"দেখেছ কালীকান্ত, ছেলেটার মাথাটা কি রকম বড়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে ধড়টা যেন সে-আন্দাজে একটু খাটো।"

"এই বড় মাথা, কিসের লক্ষণ জানো?"

"আজ্ঞে, তা তো জানি না!"

"বিদ্বানের লক্ষণ। আমি তোমাকে বলে রাখছি কালীকান্ত, আমার এই নাতি ভবিষ্যতে একজন খুব বড় পণ্ডিত হবে।"

গুরুমশাই আর তর্ক করলেন না।

ছেলেবেলায় ঈশ্বর খুব দুরন্ত ছিলেন।

তাঁর দুষ্টুমির জন্যে প্রতিবেশীরা অস্থির। সময়ে সময়ে তারা এসে ঈশ্বরের ঠাকুরমার কাছে নালিশও করতো। তাঁর দুষ্টুমি ছিল নানা রকমের। কখনো পাড়ার লোকের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খেতেন; কখনো কেউ কাপড় শুকোতে দিয়েছে দেখলেই অমনি পা টিপে টিপে গিয়ে সেই কাপড়ে ময়লা লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতেন; কখনো বা লোকের দাওয়ায় উঠে সেই জায়গাটা নোংরা করে আসতেন। আবার ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের সবুজ শীষ দেখে ঈশ্বরের মনে দুষ্টুমির সাধ জাগতো। দুহাতে পটাপট ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করতেন। এইরকম সব দুষ্টুমির জ্বালায় পাড়ার লোক, এমনকি গ্রামের লোকও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। একবার যবের শীষ খেতে গিয়ে গলায় যবের শীষ ফুটে গেল। ছেলে যায় আর কি! ঠাকুরমা গলায় আঙুল দিয়ে অনেক কষ্টে সেই শীষ বের করেন। সে যাত্রা ঈশ্বর বেঁচে গেলেন।

প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে এসে নালিশ করে যায়। দুর্গাদেবী একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন—"নাতির ভবিষ্যৎটা কি রকম হবে, বুঝতে পারছ এখন?"

"কেন? বেশ তো পড়াশুনা করছে।"

"পড়াশুনা যত না করছে, তার চেয়ে দুষ্টুমি করছে বেশী। গাঁয়ের লোক যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওর দৌরাত্ম্যে।"

"ঠাট্টা করছ বুঝি। আমি জ্যোতিষীকে দিয়ে গুণিয়ে দেখেছি, এ-ছেলে ক্ষণজন্মা না হয়ে যায় না।"

"তবে সেদিন যে বললে এঁড়ের মতো জেদী হবে এই ছেলে।"

"হবেই তো! জেদ-ই তো বড়লোকের লক্ষণ।"

দুর্গাদেবী নিরস্ত হলেন।

বীরসিংহের সকল লোকের মুখেই একটি কথা—ঈশ্বর!

দুরন্ত দামাল ছেলে, তবু সবাই ভালোবাসে তাকে। বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সব সময় এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়ায়। নয়তো ঠাকুরদার কোলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে ঈশ্বর পাঁচ বছরের হলো। এইবার হাতে খড়ি দিতে হবে। স্নেহে যেমন, শাসনেও তেমনি কঠিন তাঁর পিতামহ। পাঁচ বছর হতেই তিনি নাতির পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন পাড়াগাঁয়ে স্কুল ছিল না, ইংরেজী তো পড়ানো হতোই না। তখন শুধু ছিল পাঠশালা। পাঠশালায় পড়ানো হতো শুধু বাংলা। মাষ্টার একজন। তাঁকে বলা হতো গুরুমশাই। বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত গুরুমশাই-এর একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় ভর্তি হলেন বালক ঈশ্বরচন্দ্র। একটি খড়ের চালায় সেই পাঠশালা। পড়ুয়ারা সব মেঝেতে বসে পড়ত। মাঝখানে বসতেন গুরুমশাই। মাটিতে রাম খড়ি দিয়ে দাগ কেটে কেটে লেখা শেখানো হতো। নাতিকে ভর্তি করে দিয়ে যাবার সময়ে রামজয় গুরুমশাইকে বললেন—"দেখো কালীকান্ত, ছেলেটার দিকে একটু নজর দিয়ো। বড় জেদী আর একটু দুষ্টুও বটে। তবে বুদ্ধি খুব প্রখর।"

"আজ্ঞে আপনার নাতি বুদ্ধিমান হবে না তো কে হবে?"

"একটু যত্ন নিও ছেলেটার উপর, বুঝলে?"

"আজ্ঞে তা নেবো বই কি!"

"দেখেছ কালীকান্ত, ছেলেটার মাথাটা কি রকম বড়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে ধড়টা যেন সে-আন্দাজে একটু খাটো।"

"এই বড় মাথা, কিসের লক্ষণ জানো?"

"আজ্ঞে, তা তো জানি না!"

"বিদ্বানের লক্ষণ। আমি তোমাকে বলে রাখছি কালীকান্ত, আমার এই নাতি ভবিষ্যতে একজন খুব বড় পণ্ডিত হবে।"

গুরুমশাই আর তর্ক করলেন না।

ছেলেবেলায় ঈশ্বর খুব দুরন্ত ছিলেন।

তাঁর দুষ্টুমির জন্যে প্রতিবেশীরা অস্থির। সময়ে সময়ে তারা এসে ঈশ্বরের ঠাকুরমার কাছে নালিশও করতো। তাঁর দুষ্টুমি ছিল নানা রকমের। কখনো পাড়ার লোকের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খেতেন; কখনো কেউ কাপড় শুকোতে দিয়েছে দেখলেই অমনি পা টিপে টিপে গিয়ে সেই কাপড়ে ময়লা লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতেন; কখনো বা লোকের দাওয়ায় উঠে সেই জায়গাটা নোংরা করে আসতেন। আবার ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের সবুজ শীষ দেখে ঈশ্বরের মনে দুষ্টুমির সাধ জাগতো। দুহাতে পটাপট ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করতেন। এইরকম সব দুষ্টুমির জ্বালায় পাড়ার লোক, এমনকি গ্রামের লোকও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। একবার যবের শীষ খেতে গিয়ে গলায় যবের শীষ ফুটে গেল। ছেলে যায় আর কি! ঠাকুরমা গলায় আঙুল দিয়ে অনেক কষ্টে সেই শীষ বের করেন। সে যাত্রা ঈশ্বর বেঁচে গেলেন।

প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে এসে নালিশ করে যায়। দুর্গাদেবী একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন—"নাতির ভবিষ্যৎটা কি রকম হবে, বুঝতে পারছ এখন?"

"কেন? বেশ তো পড়াশুনা করছে।"

"পড়াশুনা যত না করছে, তার চেয়ে দুষ্টুমি করছে বেশী। গাঁয়ের লোক যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওর দৌরাত্ম্যে।"

"তা ছেলেবেলায় মহাপুরুষেরা একটু-আধটু দুষ্টুমি করে থাকেন, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না গিন্নী।"

"তোমার মহাপুরুষ নিয়ে তুমি থাক, আমি বাপু পারিনে।"

রামজয় আর তর্ক করেন না। হঠাৎ ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার কথার মধ্যে কোথা থেকে এসে দাঁড়ালেন চঞ্চল চপল ঈশ্বর। রামজয় অমনি তাকে বুকে তুলে নেন।

এমন যে দুষ্টু ছেলে, তবুও পড়াশুনায় কিন্তু ঈশ্বরের অখণ্ড মতি। পাঠশালায় একবার ঢুকলে দুষ্টুমির কথা তার মনে থাকত না। পড়তেন নিবিষ্টচিত্তে। পাঠশালার সেরা ছাত্র তিনি। খুব কম সময়ের মধ্যে সব পড়া হয়ে যেতো। যা একবার দেখতেন তাই শিখে ফেলতেন; যা একবার শুনতেন, তাই বুঝে নিতেন আর তখনই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো। কোনো ছাত্রই ঈশ্বরের সঙ্গে পেরে উঠত না। কালীকান্ত গুরুমশাই তাই দেখে বলতেন—"হবে না! কার নাতি দেখতে হবে তো!"

গুরুমশাইকে খুব ভক্তি করতেন ঈশ্বর. ভয়ও করতেন। তাঁর কাছে গুরুমশাই ছিলেন ঠিক দেবতার মতো। একে পড়াশুনায় ভালো, তার ওপর এইরকম আচরণ, সেইজন্যে কালীকান্ত ঈশ্বরকে খুব ভালো বাসতেন। তার বুদ্ধি আর মেধাশক্তি দেখে তিনি অবাক হতেন। পাঠশালার ছুটির পর তাঁকে আদর করে কাছে বসিয়ে মুখে মুখে অনেক নতুন নতুন জিনিস শেখাতেন। তারপর সন্ধ্যেবেলা নিজে কোলে করে নিয়ে ঈশ্বরকে তার ঠাকুরমার কাছে পৌছে দিতেন।

দু'বছর গেল।

একদিন রামজয় জিজ্ঞাসা করলেন—"কালীকান্ত, এঁড়েটা কি রকম পড়ছে!"

"আজ্ঞে, ঈশ্বর খুব ভালো ছেলে। ও কালে কালে খুব বড়লোক হবে।"

নাতির প্রশংসায় রামজয়ের বুক গর্বে ভরে ওঠে! বাড়িতে এসে বলেন ভগবতী দেবীকে—"বৌমা শুনেছ, কালীকান্ত বলেছে তোমার ছেলে কালে বড়লোক হবে।"

নম্রমুখী বধূ নীরবে শোনেন শ্বশুরের কথা আর মনে মনে আঁকেন ভবিষ্যতের রঙীন ছবি।

পড়াশুনায় যেমন দুষ্টুমিতেও তেমন, গায়ের জোরেও তেমনি, তাই ছেলেবেলায় ঈশ্বরের সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না। আজ-কালকার মত ফুটবল হকি ক্রিকেট তখন ছিল না; তখন কপাটি খেলার ভারি ধুম। ঈশ্বর এই খেলাতে ওস্তাদ ছিলেন। কপাটি খেলাতে বড় বড় ছেলেদের তিনি কাবু করে দিতেন।

তাঁর গায়ের জোর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বীরসিংহ গ্রামে একটা ডানপিটে ছেলে ছিল। নাম গদাধর পাল। সবাই তাকে ডাকত গদাই বলে। গদাধরের গায়ে খুব জোর। একবার গঙ্গা পার হতে গিয়ে একখানা নৌকা ডুবে যায়। গদাধর তীরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঝাঁ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে দুজন ডুবন্ত লোককে দু'বগলে ধরে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠাল। এ হেন দুর্দান্ত শক্তিশালী গদাধর, যখন কপাটি খেলায় নামতো, ঈশ্বর তাকেও অনায়াসে ধরে চিৎ করে ফেলতেন, আর তার বুকের ওপরে চড়ে বসতেন। সবাই দেখে অবাক হতো আর বলতো—ঈশ্বরের সঙ্গে কারো পারারই উপায় নেই।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল।

পাঠশালার পড়া শেষ হলো। এই সময়ে ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে দেশে এসেছেন। কালীকান্ত তাঁকে বললেন—"আমার কাছে যা-কিছু শিখবার, ঈশ্বর তা সবই শিখে ফেলেছে। এবার ওকে

কলকাতায় রেখে ইংরাজী লেখাপড়া শেখান। আপনার ছেলের যেরকম বুদ্ধি, তাতে ও একজন মস্ত বিদ্বান হবে।"

কিন্তু অতটুকু ছেলে ঠাকুরমাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে যাবে কি করে? ঠাকুরমা তো নাতি বলতে অজ্ঞান। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরদাস—"আপনি কি বলেন?"

রামজয় বললেন—"কালীকান্ত ঠিকই বলেছে। ওকে এখন তোমার কাছেই রেখে লেখাপড়া শেখাও।"

কিন্তু ঈশ্বরের ঠাকুরমা বললেন—"ওমা, সে কি কথা! ঐ একরত্তি ছেলে যাবে কলকাতায় পড়তে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো?"

রামজয় মাথা নেড়ে বলেন—"মাথা আমার ঠিকই আছে। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তো।"

"কলকাতায় না গেলে কি মানুষ হয় না?"—জিজ্ঞাসা করেন দুর্গাদেবী।

"না, তা হয় না। এখানে লেখাপড়া শিখবার স্কুল কোথায়? কলকাতায় কত স্কুল, কত কলেজ।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হলো।

ন'বছরের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস এলেন কলকাতায়। সঙ্গে আছেন গুরুমশাই কালীকান্ত।

॥ পাঁচ ॥

ঠাকুরমা ও মা সজল নয়নে বিদায় দিলেন ঈশ্বরকে।

ঈশ্বর-অন্ত প্রাণ দুর্গাদেবীর, সেইজন্য কষ্টটা তাঁরই বেশী হলো। কষ্ট আরো এইজন্যে যে, নাতিকে একদণ্ড না দেখলে তাঁর কষ্টের সীমা থাকত না, মনে মনে ভাবেন দুর্গাদেবী। শুভদিনে দুর্গানাম স্মরণ করে, জননী দুর্গাদেবীকে প্রণাম করে ঠাকুরদাস ছেলেকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

বীরসিংহ থেকে কলকাতা কম রাস্তা নয়। বাহান্ন মাইল। তখনো রেলগাড়ী হয় নি। লোকে পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকোয় যাওয়া-আসা করত। অতটুকু ছেলে অতখানি পথ হেঁটে যেতে পারবে কি না, এই ভেবে ঠাকুরমা একজন চাকরকে সঙ্গে দিলেন। দরকার হলে সে ঈশ্বরকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। পথে কদিন লাগবে কে জানে? নৌকোতে যাওয়া কারো মত নেই। কারণ তাতে নানা রকমের ভয়। চোর-ডাকাতের ভয়, নৌকো ডুবে যাবার ভয়, আরো কত কি ভয়। তাই ঠাকুরদাস হাঁটাপথেই চললেন।

ন'বছরের ছেলে বাপের হাত ধরে পায়ে হেঁটে চলেছেন কলকাতায়। বেশীর ভাগ রাস্তাই ঈশ্বর হাঁটলেন। গুরুমশাই ও ঠাকুরদাস তো ছেলের উৎসাহ দেখে অবাক। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন সঙ্গের চাকরটি তাঁকে কাঁধে তুলে নিতো। তিন দিন পথ চলার পর তাঁরা এসে উঠলেন বাঁধা পাকা রাস্তায়। নিজের গ্রাম, সঙ্গী-সাথী, মা আর ঠাকুরমাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে ঈশ্বরের মন কেমন করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন জায়গা দেখতে দেখতে আসারও একটি আনন্দ ছিল। সাল্‌খের বাঁধা রাস্তা দিয়ে চলেছেন ঠাকুরদাস। এখান থেকে শহর কলকাতা আর বেশী দূর নয়। পথে তৃষ্ণা পেল। সঙ্গে করে যা জল এনেছিলেন ঠাকুরদাস, তা ফুরিয়ে গেছে। বালক তৃষ্ণায় কাতর হয়। তাই দেখে ঠাকুরদাসও অস্থির হন। হঠাৎ নজরে পড়লো একজন লোক তরমুজের

বোঝা নিয়ে চলেছে। শেষে ঠাকুরদাস তাই একটা কিনলেন। সেই মিষ্টি ও ঠাণ্ডা তরমুজ খেয়ে ঈশ্বরের তৃষ্ণা দূর হলো।

এবার বাঁধা রাস্তা দিয়েই চলেছেন তাঁরা।

"বাবা ওটা কি?"

"কোনটা?"

"ঐ যে, ঐ বাটনা বাঁটা শিল পুঁতে রেখেছে।"

"দূর বোকা ছেলে, ওটা বাটনা বাঁটা শিল হবে কেন? ওটা তো মাইল-স্টোন।"

"মাইল-স্টোন কি বাবা?"—কৌতূহলী বালকের আবার প্রশ্ন।

"মাইল-স্টোন ইংরেজী কথা। মাইল হলো আধ ক্রোশ আর স্টোন মানে পাথর। এই রাস্তায় আধক্রোশ তফাতে এক-একখানা করে পাথর পোঁতা আছে। আর তাতে ১, ২, ৩ এই রকম অঙ্ক পর পর ইংরেজীতে লেখা আছে।"

"এই পাথরটার গায়ে কত অঙ্ক লেখা আছে, বাবা?"

"উনিশ। তার মানে এখান থেকে কলকাতা উনিশ মাইল।"

এই বলে ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে পাথরটার কাছে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখালেন। ধারাপাতে ঈশ্বর পড়েছিলেন একের পিঠে নয়—উনিশ। বালক অমনি প্রথম অক্ষরটার ওপর হাত দিয়ে বলে উঠল—"বাবা, এটা তবে ইংরেজীর ১।" তারপর ৯ অঙ্কের ওপর হাত রেখে বলেন—"আর এটা তাহলে ইংরেজীর ৯।"

ছেলের বুদ্ধি দেখে ঠাকুরদাস ভারি খুশি।

বললেন—"ঠিক বলেছিস।"

ঈশ্বরেরও মহা স্ফূর্তি। সাল্‌খে থেকে যেতে যেতেই পথের মাইল-স্টোন দেখে বালক ইংরেজীর সমস্ত অঙ্কগুলো চিনে ফেললেন।

এই দেখে কালীকান্ত গুরুমশাই ঠাকুরদাসকে বললেন—"আমি বলিনি যে, তোমার এই ছেলে কালে একজন খুব বিদ্বান হবে।"

শহর কলকাতা। আজকের দিনের মত সেদিনের কলকাতার এই চেহারা ছিল না। তখন রাস্তায় না ছিল ইলেট্রিকের আলো, না চলত ট্রাম। মোটর তো ছিলই না। জলের কলও নয়। দশতলা বারোতলা বাড়িও ছিল না। এত গাড়ীঘোড়া, লোকজন আর হট্টগোল ছিল না। নামেই শহর। তখন সন্ধ্যাবেলা হলেই পল্লীগ্রামের মতো শহরের চারদিক অন্ধকারে ভরে যেত। চৌরঙ্গীর ইন্দ্রপুরী ছিল তখন কল্পনার বাইরে। শহরের চারদিকে বন-জঙ্গল। শহরের ভেতরে নালা-নর্দমা, পুকুর আর খানাডোবা। দিনে-দুপুরে শেয়াল ডাকতো। এককথায়, ঈশ্বরচন্দ্র যেখানে পড়তে এলেন সেটা দেখতে একটা বড় পল্লীগ্রামের মতো।

ঠাকুরদাস যে বাড়ীতে থাকতেন অর্থাৎ সিংহ মশাইদের বড়-বাজারের সেই বাড়ীতেই এসে উঠলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে। তখন সিংহ মশাইয়ের ছেলে জগদ্দুর্লভবাবু সেই বাড়ীর কর্তা। বয়স বছর পঁচিশ হবে। ঠাকুরদাসকে তিনি 'খুড়ো' বলে ডাকতেন। সেই সম্পর্কে ঈশ্বর তাঁকে দাদা আর তাঁর বোন রাইমণিকে দিদি বলে ডাকতেন। মা ও ঠাকুরমাকে ছেড়ে এসে অবধি ঈশ্বরের মনটা ভালো ছিল না। রাইমণির আদর-যত্নে বালকের মন কিছুটা শান্ত হলো। তবু কলকাতা যেন তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। মায়ের জন্য মন কেমন করে, ঠাকুরমার জন্য মন ছট্‌ফট্ করে। বীরসিংহের সাথীদের জন্যেও মন কেমন করে।

কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হলো না। আসার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরের খুব পেটের অসুখ হলো। এমন অসুখ হলো যে কিছুতেই আর সারে না। খবর পেয়ে দেশ থেকে ছুটে এলেন দুর্গাদেবী। নাতি-অন্ত তাঁর প্রাণ। একটু সেরে উঠলেই তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহে ফিরলেন। ওকে আর কলকাতায় রেখে পড়াবার মত নেই তাঁর। তখন ঠাকুরদাস বলেন—"তা কি হয় মা। বাবা যে বলে গিয়েছেন—"

আর বলতে হয় না ঠাকুরদাসের। অমনি স্বামীর কথা মনে পড়ে, পৌত্র সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে হতেই দুর্গাদেবী আর অমত

করেন না। পাঁচ-ছমাস পরে ঠাকুরদাস আবার ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এইবার স্কুলে ভর্তি করতে হবে। দারিদ্র্যের জন্য নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তাই ঠাকুরদাস সেই ক্ষোভ মেটাতে চাইলেন ঈশ্বরকে লেখাপড়া শিখিয়ে। মাইনে তো পান মোটে দশটি টাকা। বন্ধুরা বললেন—"ঠাকুরদাস পারবে কি ছেলেকে কলকাতায় রেখে পড়াতে?"

উত্তরে ঠাকুরদাস বলেন—"নিশ্চয়ই পারবো। ওকে আমি হিন্দু কলেজে পড়াবো।"

বন্ধুরা শুনে অবাক্ হয়। বামুনের সাধ তো কম নয়। ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াতে চান—যেখানে বড়লোকের ছেলেরা ভিন্ন পড়তে পায় না!

"পাও তো দশ টাকা মাইনে!"—একজন বললেন ঠাকুরদাসকে, "তা ছেলেকে পড়াবে কি করে?"

"কেন, ওর জন্যে আমি পাঁচ টাকা করে খরচ করব।"—বলেন ঠাকুরদাস। "আর বাকী পাঁচ টাকা বাড়িতে পাঠাব সংসার খরচের জন্যে।"

"পাঁচ টাকায় হিন্দু কলেজে পড়ান যায় না। তোমার কি মাথা খারাপ হলো। বামুনের ঘরের ছেলেকে দেবে কিনা শেষে ঐ ম্লেচ্ছ স্কুলে।"—বললেন একজন শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়।

"তার চেয়ে ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দাও।" —উপদেশ দিলেন আর একজন।

গোলমালে পড়লেন ঠাকুরদাস। কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। তখনকার দিনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা এত বেশী ছিল না। কলকাতায় তখন এত স্কুল-কলেজও ছিল না। হেয়ার সাহেবের স্কুল, হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ—মাত্র এই তিনটি স্কুল ছিল। এ ছাড়া দু'একজন সাহেব তাঁদের বাড়িতে স্কুল খুলেছিলেন। সে-সব জায়গায় শুধু ইংরেজী পড়ান হতো। হেয়ার স্কুল আর হিন্দু কলেজে ভাল ইংরেজী পড়ানো হতো আর

সংস্কৃত কলেজে শুধু সংস্কৃত পড়ানো হতো। তখনকার দিনে যে যত বেশী ইংরেজী কথা বলতে পারতো তাকে তত বেশী বিদ্বান বলে গণ্য করা হতো।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। নামেই কলেজ, আসলে সেটা পাকা বাড়িতে একটা টোল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন সংস্কৃত কলেজে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্ররা সবাই ফরাসের উপর বসে টোলের ধরনে পড়তো। পণ্ডিতেরা আলাদা আসনে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে পড়াতেন। তাঁদের কাছে শামুকের ডিবের মধ্যে ভরা থাকতো নস্যি। তাই ঘন ঘন নাকের মধ্যে দিতেন আর পড়াতেন। মাথায় তাঁদের ঢুলতো দীর্ঘ টিকি।

ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি করে দিলেন। ঈশ্বর সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হবে, আর দেশে গিয়ে টোল খুলে বসবে—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্য-রকম। শুরু হলো কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন। বাপের কড়া শাসন আর নিজের অধ্যবসায়-এর ফলে ছাত্রজীবনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা শুনলে অবাক হতে হয়।

ব্যাকরণের ক্লাসে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তখন সংস্কৃত কলেজে কত নাম-করা অধ্যাপক। এক একজন যেন বিদ্যার জাহাজ—কেউ ব্যাকরণের পণ্ডিত, কেউ সাহিত্যের, কেউ দর্শনের। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণ পড়াতেন। জীবনে তিনি অনেক ছাত্র পড়িয়েছেন। কিন্তু এমন মেধাবী ছাত্র তিনি আর দুটি দেখেন নি। শ্রুতিধর এই বালক। যা শোনে তাই সে মনে রাখে। আর লেখাপড়াতে কি অখণ্ড মনোযোগ। এই সব দেখে তর্কবাগীশ দৃষ্টি রাখলেন ঈশ্বরের ওপর। ছ'মাস পরে একটা পরীক্ষা হলো। ঈশ্বর সেই পরীক্ষায় প্রথম হলেন এবং পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করলেন। ঠাকুরদাস খুশী হলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শুধু বললেন —"খুব মন দিয়ে পড়বি, বাবা।"

প্রথম প্রথম ঠাকুরদাস ছেলেকে সঙ্গে করে কলেজে নিয়ে যেতেন আবার ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। বড়বাজার থেকে বেনেটোলা—প্রতিদিন এইভাবে ঈশ্বর হেঁটে আসতেন। ঠাকুরদাস কারো সঙ্গে ছেলেকে মিশতে দিতেন না। পাছে ঈশ্বর শহরের আব-হাওয়ায় অসৎ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, সেইজন্যে ঠাকুরদাস সর্বদা ছেলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এবার ঠাকুরদাস যখন বুঝলেন যে, ছেলে একলা পথ চলতে পারবে এবং একলা গেলে কোনো ক্ষতি হবে না, তখন ঈশ্বরকে তিনি একলা যেতে দিলেন।

সেই সময়ে ঈশ্বর দেখতে খুব ছোট ছিলেন আর মাথাটা ছিল সেই তুলনায় প্রকাণ্ড। ছাতা মাথায় দিয়ে যখন তিনি পড়তে যেতেন, তখন দূর থেকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না যে, ছাতা চলেছে কি একটি ছেলে চলেছে। মাথা বড় ছিল বলে কলেজের ছেলেরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে ঠাট্টা করতো। ঈশ্বর চটে লাল হতেন। সেই সময়ে তিনি আবার একটু তোত্‌লাও ছিলেন। রেগে গেলে তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরুতো—তো-তো শব্দ। ছেলেরা তাই শুনে আরো হাসাহাসি করতো। সেই 'যশুরে কৈ' যখন ছুমাস পরে পরীক্ষায় সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে জলপানি পেলেন, তখন তারা রীতিমত বিস্মিত হলো।

ঈশ্বর যখন কলেজ থেকে ফিরতেন ঠাকুরদাস তখন ছেলেকে পাশে বসিয়ে সব জিজ্ঞাসা করতেন। ঠিক ঠিক বলতে না পারলে বাপের কাছে মার খেতেন। তাঁর বাবাও ব্যাকরণের বড় পণ্ডিত ছিলেন। লেখাপড়ায় এতটুকু ত্রুটি হবার জো ছিল না। যদি কোনো দিন রাতে পড়তে পড়তে ঘুমে চোখ ছুটো ঢুলে আসতো অথবা যদি তিনি পড়তে পড়তে কখনো ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে আর নিস্তার ছিল না। ঘুমন্ত ছেলের পিঠের ওপর চড়-চাপড় পড়তো। ঈশ্বর কেঁদে উঠতেন। ভেতর থেকে অমনি রাইমণি ছুটে আসতেন। ঈশ্বরকে বুকে চেপে ধরতেন আর বলতেন—"কাকা, ও তো ছেলেমানুষ। ওকে মারেন কেন?"

রাইমণির স্নেহে ঈশ্বর প্রহারের যন্ত্রণা ভুলে যেতেন।

॥ ছয় ॥

একদিন সকাল বেলায় ঠাকুরদাস বললেন—"ওরে আজকে আর স্নান করতে হবে না।" ঈশ্বরচন্দ্র অমনি উত্তর দিলেন—"না বাবা, আজই স্নান করতে হবে।" এই বলে তিনি তেল মেখে গঙ্গার দিকে চললেন। বাবা যত বলেন—"না, আজ স্নান করে দরকার নেই!" ছেলে ততই বলে—"হ্যাঁ আজকেই স্নান করব।" আবার যেদিন ঠাকুরদাস বলেন, "চল্‌রে ঈশ্বর, স্নান করে আসি!" সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক উল্টো কথা বলেন—"উহুঁ, আজ আর স্নান করব না।" যদি একবার না বললেন, তবে সহজে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া চলতো না। হয় ভয় দেখিয়ে, নয়তো মেরে, নাহলে কিছু ভালো কথা বলে বোঝাতে হতো।

মাঝে মাঝে তিনি এমন বেঁকে বসতেন যে, তার জন্যে বাবার কাছে মারধোর খেতে হতো। কখন কখন এমনও হয়েছে যে, ঠাকুরদাস ছেলেকে ধরে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিয়েছেন। জেদী ছেলে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তবুও কিছুতেই ডুব দিতেন না। শেষে অনেক মারধোরের পর জোর করে স্নান করানো হতো। স্নানের বেলায় যেমন, ফর্সা কাপড়-জামার ব্যাপারেও ঠিক তাই। যেদিন ঠাকুরদাস বলতেন—"ওরে, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরে স্কুলে যা।" ঈশ্বর অমনি মনে মনে ঠিক করতেন যে, সেদিন তিনি একখানা ময়লা কাপড় পরে যাবেন। কাজেও ঠিক তাই করতেন। এই জন্যে মাঝে মাঝে ঠাকুরদাস বলতেন—"বাবা কি, সাধ করে তোকে 'এঁড়ে বাছুর' বলেছিলেন।"

ঠাকুরদার কথা মনে পড়তেই ঈশ্বরচন্দ্র শান্ত হয়ে যেতেন।

এগারো বছর বয়সে ঈশ্বরের ব্যাকরণ পড়া শেষ হলো। এবার তিনি সহিত্যের ক্লাসে উঠলেন। সেই সময় ঠাকুরদাস ছেলের পৈতে দিলেন। পৈতে দিলেন বটে, কিন্তু বামুনের ছেলের যা নিজ কর্ম, অর্থাৎ সেই তিন বেলা গায়ত্রী জপ করা, তা বড় একটা তিনি করতেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক করা দূরে থাক, বামুনের ছেলে হয়ে

তিনি ছেলেবেলা থেকেই কোন রকম ঠাকুরদেবতার পূজা করা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন মাত্র দু'জন—মা আর বাবা। সারা জীবন তিনি এঁদের পূজা করেছেন। বলতেন—"সংসারে পিতামাতাই জীবন্ত দেবতা।"

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তখন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। অতটুকু ছেলে সাহিত্য পড়বে—এ যেন তিনি বিশ্বাস করতেই পারলেন না। এগার বছরের ছেলে সাহিত্যের বোঝেই বা কতটুকু। তাই তিনি আপত্তি করলেন। তাঁর সন্দেহ হলো যে, এগার বছরের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝতে পারবে না। ঈশ্বরের অভিমান হলো। তিনি বললেন—"বেশ, আমাকে পরীক্ষা করে নিন।"

তর্কলঙ্কার মশাই তো এই কথা শুনে অবাক।

শুধু পরীক্ষা করে নেওয়া নয়, সেই সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এ কথাও বললেন যে, যদি তিনি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারেন, তাহলে তিনি কলেজ ছেড়ে দেবেন। এমন কথা তো তিনি আজ পর্যন্ত কোন ছেলের মুখে শোনেন নি। কৌতুহল হলো তাঁর। পরীক্ষা করলেন। ভট্টি থেকে বেছে বেছে কয়েকটা কঠিন শ্লোকের মানে করতে দিলেন। বড় বড় অধ্যাপকেরা ঠিক যে ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, তার চেয়েও ভালো করে ব্যাখ্যা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তর্কালঙ্কার খুব সন্তুষ্ট হলেন। বুঝলেন, এ প্রকৃতই একজন মেধাবী ছেলে। আর আপত্তি নেই। তিনি তাঁকে সাহিত্যের ছাত্র করে নিলেন।

বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দুষ্টুমি কমে গিয়েছে। কিন্তু জেদটা আছে পুরোমাত্রায়। সব জেদটা গিয়ে পড়ল এখন লেখাপড়ার ওপর। প্রায় সারা রাত জেগেই তিনি লেখাপড়া করতে শুরু করলেন। সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পড়তেন। তারপর শুতে যেতেন। শুতে যাবার সময়ে বাবাকে বলে যেতেন দু'ঘণ্টা পরে জাগিয়ে দিতে। কাছেই আর্মানি গির্জার ঘড়িতে যেই ঢং ঢং করে বারোটা বাজতো, অমনি ঠাকুরদাস ছেলেকে জাগিয়ে

দিতেন। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত রাত জেগে পড়তেন। লেখাপড়া ছিল তাঁর কাছে তপস্যার মতো।

শুধু লেখাপড়া নয়? এই সময়ে কলকাতার বাসায় তাঁর মেজ ভাই দীনবন্ধু এসেছেন, তিনিও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ঠাকুরদাসের অল্প মাইনে। বাসায় ঝি-চাকর বা রাঁধুনী ছিল না। দু'বেলা রান্নার কাজ ঈশ্বরকেই করতে হতো। শুধু কী রান্না! এই সময় তাঁর রোজকার কাজের রুটিন ছিল এইরকম ঃ ভোরবেলায় ওঠা। একটুখানি পড়া। তারপর স্নান করা। স্নান করে ফিরবার সময়ে বাজার করা। নিজের হাতে তরকারী কোটা, বাটনা বাঁটা, উনুন ধরানো, এমনকি উনুন ধরানোর জন্য কাঠ চেলা করা। বাসায় তখন খাবার লোক চার-পাঁচ জন। উনুন ধরিয়ে রান্না করতেন আর রান্নার ফাঁকে ফাঁকে পড়তেন। রান্না হলে সকলকে খাইয়ে নিজে সকলের শেষে খেতেন। তারপর এঁটো পরিষ্কার করে, বাসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে তবে কাজের শেষ হতো তাঁর। তখন আবার কিছুক্ষণ পড়বার সময় পেতেন। তারপর কলেজে যেতেন। পথে যেতে যেতে পড়ার বিরাম ছিল না। এমন করে ছেলেবেলায় কারো জীবন কেটেছে বলে শোনা যায় না।

এত খাটুনি, কিন্তু তার উপযুক্ত খাওয়া-দাওয়া ছিল না তাঁর। সব দিন ভাল করে খেতেই পেতেন না। কি কষ্টে যে তাঁর দিন কাটতো তা আর কি বলবো। শুনতে ঠিক রূপকথার মতো লাগে। কোনোদিন ভাত জুটতো, কোনোদিন ভাত জুটতো না। যেদিন জুটতো, সেদিন পেটভরেও খেতে পেতেন না। যেদিন পেটভরে ভাত জুটতো, সেদিন আবার তরকারী জুটতো না—শুধু নুন মেখে ভাতগুলো খেতে হতো। মাছ তরকারি যদি হতো কোন দিন, সেদিন একবেলা খালি ঝোলটুকু, একবেলা বা শুধু তরকারিগুলো, একবেলা বা মাছটুকু —এই রকম হিসেব করে দু'তিন দিন চালাতে হতো। এর এদিক-ওদিক হলে বাবার কাছে বকুনি খেতে হতো।

সাহিত্যের ক্লাসেও ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম হলেন। যতবার পরীক্ষা হয়, তিনিই বেশী নম্বর পান। সকল ছেলেদের পেছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান। সংস্কৃত সাহিত্যের যত কঠিন কঠিন বই—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তররামচরিত, কাদম্বরী—সবই তাঁকে পড়তে হয়েছিল। আর সে কি যেমন তেমন করে পড়া, একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। এসব বই তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। সাহিত্যের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র খুব কৃতিত্ব দেখালেন। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের আর গর্বের শেষ নেই। এখন ঈশ্বরচন্দ্র এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃত বলতে পারেন যে, মুখে যেন খই ফুটছে। তোতলামি আর নেই। শুধু কি সুন্দর অনর্গল সংস্কৃত বলা—বিচারও করতে শিখেছেন।

দেশে ফিরলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সকলের আগে কালীকান্ত গুরুমশাইয়ের কাছে গেলেন। তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তিনি আশীর্বাদ করলেন। আজ তাঁর ছাত্র কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে—এ কী তাঁর কম গর্বের বিষয়। এখানে-ওখানে শ্রাদ্ধের সভা উপলক্ষে রামজয় তর্কভূষণের নাতি নিমন্ত্রিত হন। সভায় পণ্ডিতদের সঙ্গে কিশোর বিচারে প্রবৃত্ত হন। লোকে দেখে অবাক হয়। হ্যাঁ, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে বটে রামজয়ের নাতি, সবাই বলে সবিস্ময়ে। আশে-পাশের গ্রামে নাম ছড়িয়ে পড়ল। মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে বীরসিংহের রামজয় তর্কভূষণের নাতির বিদ্যার কথা ছড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুরদাস এই সময়ে ছেলেকে নিয়ে একবার দেশে এসেছেন। ভগবতীদেবী বললেন—“ঈশ্বরের একটা বিয়ে দাও।”

“এরই মধ্যে বিয়ে কি? এখনো তো ওর পড়াই শেষ হলো না।”

“আর কত পড়বে? লোকে যে বলে ও নাকি খুব পণ্ডিত হয়েছে।”

“এখনো পড়ার কত বাকী। অলঙ্কার পড়বে, ন্যায় পড়বে, দর্শন পড়বে, তবে তো।

কিন্তু ভগবতীদেবী ছাড়লেন না। তখন ঈশ্বরের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। অতটুকু বয়সে ছেলের বিয়ে দেবার খুব ইচ্ছা ছিল না ঠাকুরদাসের। তবু স্ত্রীর অনুরোধে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন। ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেজ মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিয়ে হয়ে গেল, একদিন এক শুভলগ্নে। দীনময়ীর বয়স তখন আট বছর। যেমন সুলক্ষণা, তেমনি সুন্দরী। বিয়ের পর বিদ্যাসাগর আবার কলকাতায় ফিরলেন।

এবার অলঙ্কার।

এই ক্লাসের অধ্যাপক ছিল প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। শুধু অলঙ্কার নয়—ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও তিনি একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। বড় ক্লাস, বড় বড় বই, কঠিন কঠিন বই—এইসব পড়তে এবং বুঝতে ঈশ্বরচন্দ্রকে বেশ পরিশ্রম করতে হতো। বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম হলেন। তর্কবাগীশ বুঝলেন, এ-ছাত্র সাধারণ ছাত্র নয়। এই সময়ে ঈশ্বরের খুব কঠিন অসুখ করলো। একে পরীক্ষার জন্যে কঠিন পরিশ্রম, তার ওপর বাসার সব রকম কাজের ভার তাঁর ওপর—অতটুকু শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? এই সময়ে চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কিছুদিন বীরসিংহে গিয়ে থাকতে হলো।

অলঙ্কারের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বর সকলের ওপরে হলেন, অনেক টাকার জলপানি আর ভালো ভালো বই পুরস্কার পেলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রমহলে এবং অধ্যাপক মহলেও ঈশ্বরের এখন খুব নাম-যশ। সকলের মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। শুধু যে লেখা-পড়াতেই পণ্ডিত হচ্ছেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে অনেক ভালো ভালো গুণের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণ যত্নে বাপ-মায়ের সেবা করতেন। দেবতার চেয়ে তাঁদের বড় বলে মানতেন, ছোট ভাইগুলিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। আর তাদের খাইয়ে নিজে খেতেন। একটু কিছু হলে ভেবে আকুল হতেন। এই সময়কার একটা ঘটনা।

একদিন দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময়ে তিনি বাজারে পাঠালেন। রাত একটা বেজে গেল, তখনও দীনবন্ধু ফিরল না দেখে, ঈশ্বরের খুব ভয় ও ভাবনা হলো। ভাইয়ের জন্যে তিনি কাঁদতে লাগলেন। সে কী কান্না! তারপর একজনের কথামত তিনি দীনবন্ধুকে খুঁজতে কালীবাবুর বাজারে গেলেন। সেখানে তাকে পেলেন না। আরো ভয় হলো। ব্যাকুলভাবে বড়বাজার থেকে গেলেন নতুন বাজারে। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়ে দীনবন্ধু ঘুমিয়ে আছে। সেখান থেকে ভাইকে তিনি বাসায় নিয়ে এলেন।

শুধু বাড়ীতেই নয়, বাইরের লোকজনের প্রতিও তাঁর দয়ার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল এই সময় থেকেই। ভগবান তাঁকে যে দয়া-মায়া দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, এখন থেকেই ধীরে ধীরে লোকে তার পরিচয় পেতে লাগল। নিজের কতো অভাব, কিন্তু যদি দেখতেন, কোনো লোক কষ্টে পড়েছে, তাহলে যেমন করে হোক তার উপকার করতেন। যদি কোনো সহপাঠীর অসুখ করেছে শুনলেন, অমনি ছুটলেন তার সেবা করতে এবং সাধ্য মত তার ঔষধ পথ্য জোগাতেন। যে ছেলের বই নেই, নিজের জলপানির কটি টাকা থেকে তাকে বই কিনে দিতেন, যার কাপড় নেই, তাকে কাপড় কিনে দিতেন। নিজে কিন্তু মায়ের দেওয়া মোটা আর খাটো কাপড় পরে কলেজে যেতেন। এই কাপড় ভগবতীদেবী ঈশ্বরচন্দ্রের জন্যে নিজের হাতে তৈরি করে পাঠাতেন।

হাতে পয়সা থাকলে কলেজে যদি কোনোদিন জলখাবার খেতেন, সে সময় সামনে যারা থাকতো, তাদের যত্ন করে খাওয়াতেন। ভবিষ্যতে যিনি দয়ার সাগর নামে বিখ্যাত হবেন, তাঁর ছাত্র-জীবনেই তাঁর মধ্যে এইসব গুণের বিকাশ দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেতো। এসব জিনিস কেউ তাঁকে শেখাত না, তিনি নিজের মন থেকেই করতেন। যখন কলকাতা থেকে গ্রামে যেতেন, তখন সেখানেও গিয়ে প্রতিবেশী ছেলেদের খোঁজখবর

নিতেন। কেউ কষ্টে পড়েছে শুনলে, সাধ্যমত তার উপকার করতেন। গাঁয়ের লোকেরা তখন থেকেই ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলতে শুরু করেছে। তারা বলতো—"হবে না, কতবড় লোকের নাতি। রামজয় ছিলেন দেবতা। দেবতার ঘরেই তো দয়াময় আসেন।"

গ্রামের সকল লোকের সরল কথায় ভগবতীদেবীর বুকখানা পুত্রগর্বে ভরে উঠতো।

ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার মোড়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ী। মস্তবড় পণ্ডিত তিনি।

তাঁর বাসায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই যেতেন কলেজের ছুটির পর। সেখানে সেই সময়ে কলেজের অনেক ছাত্র আসত। তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হতো তাঁর। একদিন সন্ধ্যায় সেখানে এসেছেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। দর্শনের একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সাহিত্য-দর্শন আবৃত্তি করছিলেন। তর্কপঞ্চানন মশায় তাই শুনে অবাক হলেন। জানতে চাইলেন ছেলেটি কে? তর্কবাচস্পতি বললেন—"এটি সংস্কৃত কলেজের রত্ন। বীরসিংহের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে, রামজয় তর্কভূষণের নাতি।"

"কিন্তু এতটুকু ছেলে সাহিত্য-দর্শনের কি বুঝবে?"—জিজ্ঞাসা করেন তর্কপঞ্চানন।

"একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না।"—বললেন তারানাথ।

তর্কপঞ্চানন মশায় কতকটা কৌতুকের বশে ঈশ্বরের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। দেখলেন, বালক এক অসাধারণ পণ্ডিত। সকলের সামনেই তিনি বললেন—"এ-বালক কালে সমগ্র বাংলাদেশে অদ্বিতীয় লোক হবে।"

পরে সত্যই এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। সত্যই ঈশ্বরচন্দ্র সকল বিষয়ে বাংলার অদ্বিতীয় পুরুষ হয়েছিলেন।

অলঙ্কার পড়বার সময়েই কলেজের অধ্যক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঈশ্বর স্মৃতিশাস্ত্র পড়তে শুরু করেন এবং দু'এক বছরের

মধ্যেই তিনি স্মৃতির সকল কঠিন শাস্ত্র পড়ে শেষ করলেন। স্মৃতি বড় কঠিন শাস্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরের একাগ্রতা ও উদ্যমের কাছে কঠিন বলে কিছুই ছিল না। এখানেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সবাইকে অবাক করলেন। স্মৃতির শেষ পরীক্ষায় তিনি আশি টাকা পুরস্কার পেলেন এবং সংস্কৃত গদ্য রচনায় প্রথম হয়ে একশো টাকা পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারের এই টাকা তিনি তাঁর বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—"আপনি এই টাকায় তীর্থ করে আসুন।"

স্মৃতির পরীক্ষায় পাশ করে তিনি 'জজ পণ্ডিত' হবার জন্যে পরীক্ষা দিলেন। 'জজ পণ্ডিত'-এর চাকরী হলো এখনকার মতো হাকিমের পদ। খুব সম্মানের চাকুরী। অনেক বয়সে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করে তবে লোকে এই পরীক্ষা দিতে পারতো। ঈশ্বরের কিন্তু সবই অদ্ভুত! যেই পরীক্ষা দেওয়া অমনি পাশ করা—যেমন তেমন পাশ নয়, সকলের চেয়ে বেশী নম্বর রেখে পাশ। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'জজ পণ্ডিত' হলেন। ঠাকুরদাসের কি আনন্দ! একটা চাকুরীও সেই সময়ে তিনি পেয়ে গেলেন ত্রিপুরায়। কিন্তু তখনও তিনি ছেলেমানুষ, সেইজন্যে ঠাকুরদাস তাঁকে একা দূরদেশে পাঠাতে রাজী হলেন না। বাবার মত নেই তাই ঈশ্বরচন্দ্র সে চাকুরী নিলেন না। আবার পড়তে গেলেন।

এরই মধ্যে তিনি কিছু ইংরেজীও শিখেছিলেন। সংস্কৃতে তো তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় মজলিশে বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেন, শাস্ত্রের বিচার করতেন। মুখে মুখে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত কবিতা, শ্লোক তৈরি করতে পারতেন। তারপর ঈশ্বর ন্যায় আর দর্শনের ক্লাসে ভর্তি হলেন। তিন বছরে ন্যায়ের পড়া শেষ হলো। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে একশো টাকা পুরস্কার পেলেন।

সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ হলো ঈশ্বরচন্দ্রের।

আর কোনো বিষয়ই পড়বার বাকী রইল না।

সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছেন, জলপানিও পেয়েছেন।

অধ্যাপকেরা মহা খুশি। এ হেন কৃতী ছাত্রকে তো আর অন্য ছাত্রদের মতো শুধু একখানা সার্টিফিকেট দিলে চলবে না। তাঁরা সবাই ঠিক করলেন—এমন একটা কিছু এঁকে দিতে হবে যা আর কোনো ছাত্রকে কখনো দেওয়া হয় নি। তখন সকলে মিলে একমত হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিলেন।

বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামজয়ের সেই 'এঁড়ে বাছুর' হলেন এবার 'বিদ্যাসাগর'।

দুর্গাদেবী, ভগবতীদেবী আর ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা রইল না!

এই সময় থেকে তাঁর আসল নাম ঢাকা পড়ল আর দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল শুধু তাঁর নতুন উপাধি—বিদ্যাসাগর।

তার মধ্যেই রইল তাঁর আসল পরিচয়।

আর রইল একটা যুগের ইতিহাস—যে যুগে বাংলার মাটিতে সোনার ফসল ফলেছিল। শিক্ষায়, সমাজ-সংস্কারে, রাজনীতিতে, এক একটি দিক্‌পাল জন্মেছিলেন সেই সময়ে। তাঁদেরই মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রধান ছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর। প্রধান ছিলেন তিনি তাঁর চরিত্র আর হৃদয়ের শক্তিতে।

॥ সাত ॥

গয়া তীর্থ করে কলকাতায় ফিরলেন ঠাকুরদাস।

এসে শুনলেন তাঁর ছেলে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছেন। জীবন সার্থক মনে করলেন তিনি। দশ টাকা মাইনের চাকরী করে কী কষ্টেই না তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আজ তাঁর সে-কষ্ট স্বীকার করা সার্থক হয়েছে। তীর্থ করতে গিয়ে কিছু দেনা হয়েছিল ঠাকুরদাসের। কথায় কথায় ছেলের কাছে কথাটা তুললেন তিনি একদিন।

বিদ্যাসাগর বললেন—"তার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন বাবা। দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে, সবচেয়ে ভালো সংস্কৃত কবিতা লিখে আর আইনের পরীক্ষা দিয়ে মোট ২০৩৲ টাকা আমি পেয়েছি। সেই টাকা তো সবই রয়েছে, আমি কিছুই খরচ করিনি। তাই দিয়ে আপনি তীর্থের দেনা শোধ করুন।"

উপযুক্ত ছেলের উপযুক্ত কথা।

পুত্রগর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে ওঠে। মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করেন ছেলেকে।

সংস্কৃত কলেজে যে বারো বছর তিনি পড়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সবশুদ্ধ সাতটা বিষয়ে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন—ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ আর দর্শন। তাই না তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করলেন। তারপর শেষ হলো তাঁর ছাত্রজীবন। এইবার বিদ্যাসাগর কর্ম-জীবনে প্রবেশ করলেন।

বাবার ইচ্ছে ছিল দেশে গিয়ে বিদ্যাসাগর একটি টোল খোলে; কিন্তু পরে তাঁর সে মত বদলায়। অবশ্য দেশেও বিদ্যাসাগর স্কুল করেছিলেন। কলকাতায় তখন গোলদীঘিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বলে একটা কলেজ ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যেসব সাহেবরা এদেশে চাকরী নিয়ে এসে থাকতেন, তাঁদেরই পড়াবার

জন্যে এই কলেজটা হয়েছিল। এইখানে তাঁদের বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ইত্যাদি ভাষা শিখতে হতো। মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ। সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম তিনি শুনেছেন। সেইজন্য একদিন মার্শাল সাহেব নিজে থেকেই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন হেড পণ্ডিতের একটা চাকরী খালি হয়েছে। সাহেবের ইচ্ছা বিদ্যাসাগরকে সেই কাজটা দেন। তাই নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন তিনি। বিদ্যাসাগর রাজীও হলেন। সেই থেকে সাহেবদের বাংলা পড়াবার জন্যে হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

চাকরী হলো। তখনকার দিনের হিসেবে বেশ ভালো চাকরী। বিদ্যাসাগর তখন ঠাকুরদাসকে বললেন—"বাবা, আমার তো এখন ভালো চাকরী হয়েছে। আপনি এইবার দেশে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আর আপনাকে খাটতে হবে না।"

এই কথা শুনে ঠাকুরদাস খুশী হলেন। ছেলেকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলে তিনি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিখতে লাগলেন। সেই সঙ্গে হিন্দীও। আশ্চর্য মেধাবী ছিলেন তিনি। তাই অল্প দিনের চেষ্টাতেই তিনি এই দুটি ভাষা সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে ফেললন।

তালতলার দুর্গাচরণ ডাক্তার ছিলেন বিদ্যাসাগরের খুব প্রিয় বন্ধু। বেশ ইংরেজী জানতেন তিনি। বিদ্যাসাগর প্রথমে তাঁর কাছেই ইংরেজী শিখেছিলেন।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের জ্ঞান বুদ্ধি আর কাজ করবার ক্ষমতা দেখে উপরওয়ালারা খুব সন্তুষ্ট হলেন। বড় বড় সাহেব, যাঁরা তাঁর চাইতে বেশী মাইনে পেতেন, তাঁরাও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ না করে কাজ করতেন না। ইংরেজ রাজপুরুষ মহলে তাঁর খাতির দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। অথচ এতে তাঁর কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না; কোনো প্রত্যাশাও ছিল না।

যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, তেমনি স্বাধীনচেতাই রইলেন তিনি। চাকরীর জন্যে নিজের সম্মান তিনি এতটুকু বিসর্জ্জন দেন নি কোনো দিন। এমনকি যখন বিদ্যাসাগরের ওপর সাহেবদের পরীক্ষার ভার পড়তো তখনও সেখানে তাঁর নিরপেক্ষতা এবং নির্ভীকতা দেখে সবাই বিস্মিত হতো।

বিদ্যাসাগরের বন্ধু-প্রীতি কি রকম অদ্ভুত ছিল, তা শুনলে এখনও আশ্চর্য হতে হয়। যাঁর কাছে তিনি প্রথমে ইংরেজী শিখেছিলেন, সেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনো ডাক্তার হন নি। তখনো তিনি হেয়ার স্কুলের মাষ্টার। তাছাড়া ডাক্তারী পড়তে প্রচুর খরচের ব্যাপার। ঠিক সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের একটা চাকরী খালি হলো। মাইনে আশী টাকা। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ করলেন এই কাজটা দুর্গাচরণবাবুকে দেবার জন্য।

"কী রকম ইংরেজী জানেন আপনার বন্ধু?"—জিজ্ঞাসা করেন মার্শাল।

"খুব ভালো! এমন ইংরেজী সাহেবরাও বলতে পারে না।" —বললেন বিদ্যাসাগর।

"তাই নাকি! তাহলে ওঁকেই আমি এই পদে নিযুক্ত করলাম।"

বন্ধুর জন্যে এই উপকারটুকু করতে পেরে বিদ্যাসাগরের সে কী আনন্দ! এই চাকরীটা হয়েছিল বলেই দুর্গাচরণবাবু মেডিকেল কলেজে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বন্ধু-প্রীতির আরও একটা গল্প আছে।

সংস্কৃত কলেজে নব্বই টাকা মাইনের একটা চাকরী খালি হলো। কলেজের অধ্যক্ষের ভারি ইচ্ছা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এই কাজটা গ্রহণ করেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড পণ্ডিতের চাকরী করে তিনি, মাসে মাইনে পান মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আর এই চাকরীটা নিলে মাইনে হয় নব্বই টাকা।

মার্শাল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"কি পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের চাকরীটা নেবেন নাকি?"

"না। এইখানেই তো চাকরী করছি।"

তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কর্তাদের অনুরোধ করলেন যাতে এই চাকরীটা আর একজন যোগ্য পণ্ডিতকে দেওয়া হয়। তিনি তাঁরই এক বন্ধু। নাম—তারানাথ বাচস্পতি। একসঙ্গে পড়েছেন। কথা দিয়েছিলেন যে, যদি কখনো সুযোগ আসে তাহলে তিনি বন্ধুর উপকার করবেন। সেই সুযোগ যখন এলো, তখন তিনি বন্ধুর জন্যে ঠিকই স্বার্থ ত্যাগ করলেন।

সময়মত আবার গিয়ে সাহেবকে বললেন—"ইনি খুব যোগ্য পণ্ডিত। এঁকেই এই কাজটা দেওয়া হোক। আমার তো একটা চাকরী আছে। এঁর নেই, এঁর প্রকৃতই দরকার।"

বিদ্যাসাগরকে পেলে শিক্ষা বিভাগের কর্তা ময়েট সাহেব খুশী হতেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ তিনি ফেলতে পারলেন না। শেষে তারানাথ বাচস্পতিকেই সেই নব্বই টাকা মাইনের চাকরীটা দেওয়া হলো। তবে তাতে আর এক বিপদ দেখা দিলো। বাচস্পতি থাকেন কালনায়—কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। এখন কে তাঁকে খবর দেবে?

সেদিন ছিল শনিবার। সোমবার থেকেই কাজ করতে হবে। চিঠি পাঠালে কাজ হবে না। বন্ধুর জন্যে বিদ্যাসাগর এতটা করলেন আর বাকীটা করতে পারবেন না? তাই সেই রাত্রেই তিনি পায়ে হেঁটে কালনা রওনা হলেন। সারা রাত পথ চলে পরের দিন দুপুরবেলায় ধূলি-ধূসরিত পদে বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন বন্ধুর বাড়িতে। পৌঁছে প্রথমেই দিলেন তাঁকে সু-খবর। শুনে বাচস্পতির মুখে কথা নেই। চোখের নীরব অশ্রুধারায় জানালেন তিনি কৃতজ্ঞতা। মুখে শুধু বললেন—"ভাই, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা।"

সেই থেকে সংস্কৃত কলেজে যখনই নতুন অধ্যাপক নেওয়ার দরকার হতো, অমনি ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই পরামর্শ করে কাজ করতেন।

বড়বাজার থেকে বিদ্যাসাগর এখন উঠে এসেছেন বৌবাজারে। নিজেই একটা আলাদা বাসা করেছেন। ন-দশজন লোক বাসায়। ঠাকুরদাস থাকেন দেশে। বাবাকে প্রতি মাসে তিনি কুড়ি টাকা করে পাঠিয়ে দেন। বাকী ত্রিশ টাকায় তিনি কলকাতার বাসা-খরচ চালান। তিনটি ভাই, দুটি খুড়তুতো ভাই, দুটি পিসতুতো ভাই, একটি মাসতুতো ভাই আর পুরনো চাকর শ্রীরাম—এই ন'জনকে নিয়ে কলকাতায় থাকেন বিদ্যাসাগর। এছাড়া নিজের সংস্কৃত চর্চা আছে, ইংরেজী পড়া আছে, আবার পাঁচজনকে সংস্কৃত পড়াতেও হয়, তার ওপর কলেজের চাকরী। এত সব করেও তিনি ভালো করে রান্নার কাজটি ঠিকমত দেখতেন। একটি মুহূর্তও তিনি বৃথা কাটাতেন না। কেবল কাজ আর কাজ!

চাকরী করেন বলে নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করতেন না। তাস, পাশা তো জীবনে ছুঁতেন না। কাউকে খেলতে দেখলে বিরক্ত হতেন। দিনরাত কাজ নিয়ে থাকতেন বিদ্যাসাগর। পরিশ্রম ছিল তাঁর জীবনের সাথী। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়েছেন যখন তখনো যেমন পরিশ্রম করেছেন পরে যখন পাঁচশো টাকা রোজগার করেছেন তখনো সেই একই ভাবে পরিশ্রম করে গেছেন, আর কষ্ট স্বীকার করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাহেবদের বাংলা পড়াতেন এবং বাংলার পরীক্ষাও নিতেন তিনিই। হেড্ পণ্ডিত তো হেড্ পণ্ডিত! তাঁর ওপর কারো কোন কথা বলার উপায় ছিল না। সেই তাঁর প্রথম চাকরী, তবু চাকরীর মায়া নেই এতটুকু। যেসব ইংরেজ বিলেত থেকে এদেশে আসতেন, তাঁদের সবাইকে দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে হতো। পাশ করতে পারলে তবে তাঁরা সিভিলিয়ান হতেন। পাশ না করতে পারলে আবার দেশে ফিরে যেতে হতো। বিদ্যাসাগরের ওপর ছিল তাঁদের বাংলা ও হিন্দী পরীক্ষা নেওয়ার ভার। তিনি ন্যায়মতো পরীক্ষা নিতেন; কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না।

একদিন মার্শাল সাহেব তাঁকে বললেন—"আপনি বড় কঠিন করে সাহেবদের পরীক্ষা করেন। আর একটু যদি সহজ ও নরম হন, তাহলে ভালো হয়। যারা ফেল করে তাদের যে আবার দেশেই ফিরে যেতে হয়। অত কষ্ট করে এবং খরচ করে তারা আসে, অথচ চাকরী পায় না। বিফল হয়ে দেশেই ফিরে যায়।"

বিদ্যাসাগর বললেন—"ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। যে পাশ করার যোগ্য নয়, তাকে পাশ করিয়ে দেবো কেমন করে?"

"না, না—সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি যে, তাদের অবস্থা বুঝে পরীক্ষার সময় যদি বিশেষভাবে একটু বিবেচনা করেন, তাহলে বেচারীদের উপকার হয়।"

"আমি তা পারব না।"

"কেন পারবেন না?"

"যার যোগ্যতা নেই তাকে পাশ করানো মানে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া। আমাকে দিয়ে এ-কাজ চলবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন।"

মার্শাল সাহেব পণ্ডিতের মুখে এইরকম নির্ভীক জবাব শুনে অবাক হলেন। তাঁর ওপর আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। বললেন—"আচ্ছা, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। আমি এ-বিষয়ে আর কিছু বলতে চাইনে!"

চাকরী করতে গিয়েও বিদ্যাসাগর এমনি স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন পদে পদে। তাঁর এই কর্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাঁকে ইংরেজ রাজপুরুষদের চক্ষে পরম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

হঠাৎ বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।

মা লিখছেন: "তুমি অতি অবশ্য বাড়ি আসিবে।"

ভাইয়ের বিয়ে, তার ওপর মা ডেকে পাঠিয়েছেন, বিদ্যাসাগর কি আর স্থির থাকতে পারেন?

মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সে সময় কলেজে এত বেশী কাজ যে, অধ্যক্ষ কিছুতেই ছুটি দিতে রাজী হলেন না। এদিকে বাসার সবাই চলে গেছে। তাদের মারফৎ বিদ্যাসাগর মাকে বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি পরে আসছেন। অথচ সাহেব ছুটি দিতে নারাজ। মন খারাপ হয়ে গেল। ভাইয়ের বিয়ে, মা যেতে লিখেছেন, তবুও তিনি তো ছুটি পেলেন না। তাহলে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না! এই ভেবে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের মনে খুব কষ্ট হলো। সারা রাত ঘুম হলো না।

পরের দিন তিনি সাহেবকে গিয়ে বললেন—"আমার মা আমায় বাড়ি যেতে বলেছেন, আমায় যেতেই হবে। হয় ছুটি দিন, না হয় আমি কাজ ছেড়ে দেব।"

পণ্ডিতের মাতৃভক্তি দেখে মার্শাল সাহেব যারপর নাই আশ্চর্য হলেন। তখনি তিনি ছুটি মঞ্জুর করলেন। ছুটি পেয়ে বিদ্যাসাগরের তো মহা আনন্দ! অমনি ছুটলেন বাড়ির দিকে।

তখন বর্ষাকাল। ঘোর দুর্যোগ। বর্ষায় দামোদরের বুকে তখন প্রবল বন্যা। নদীতে একখানা নৌকোও নেই। কিন্তু সেদিন তাঁকে বীরসিংহে পৌঁছতেই হবে। সেদিন রাত্রেই বিয়ে। মা যে পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন! কি করেন, মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। মায়ের নাম স্মরণ করে বিদ্যাসাগর দুরন্ত দামোদরের বুকে ঝাঁপ দিলেন। বর্ষায় ভরা দামোদর সাঁতরে পার হলেন তিনি। এ-পারে এসে অনেকটা পথ হাঁটলেন। পথে পড়ে আর একটা খরস্রোতা নদী—দারকেশ্বর। সেটাও তেমনি সাঁতরে পার হলেন। রাস্তার মাঝে সন্ধ্যা নামল। পথে চোর-ডাকাতের ভয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর নির্ভীক। মনে মনে মাকে ডাকতে লাগলেন তিনি আর পথ চলতে লাগলেন। রাত্রি দশটার সময় ভিজে কাপড়ে, ক্লান্ত শরীরে তিনি বাড়ি পৌঁছলেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি ডাকলেন—"মা! মা, আমি এসেছি!"

॥ আট ॥

পাঁচ বছর কাজ করলেন বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে।

কাজ করলেন খুব সুখ্যাতির সঙ্গেই।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের চাকরী খালি হলো। রসময় দত্ত তখন কলেজের সম্পাদক। তিনি কলেজে পুরো সময় দিতে পারেন না। সেইজন্য একজন ভালো সহকারী দরকার। শিক্ষা বিভাগের কর্তা, ডাঃময়েট ঐ নতুন পদের জন্য একজন যোগ্য লোক রাখার বিষয়ে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত দুটো ভাষাই ভালো করে জানেন এবং যিনি কলেজের উন্নতি সাধনে সক্ষম এমন একজন লোক তাঁর দরকার। তখন মার্শাল সাহেব বললেন—"এমন লোক তো দেখছি একজনই আছেন।"

"কে তিনি?"

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

"তিনি কি সেখানকার চাকরী ছেড়ে আসতে রাজী হবেন?"

"আমি জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি একবার।"

তারপর মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"পণ্ডিত, আপনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের চাকরী নেবেন?"

"নিতে পারি, তবে একটা কথা আছে!"—বললেন বিদ্যাসাগর।

"কি কথা?"

"যদি সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পাই, তবেই যেতে পারি। নইলে দরকার নেই।"

"তাতে বোধ হয় কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।"

"আর একটা কথা আপনাকে বলবো। আমি চাকরীতে ঢোকার পর থেকে আমার বাবাকে আর কাজ করতে দিই না। সংসারের ভার এখন আমার ওপর। যদি কোনো কারণে কলেজের চাকরী আমাকে ছাড়তে হয়, তখন খুবই বিপদে পড়ব। তাই বলছি যে,

এখানকার হেড পণ্ডিতের কাজটা যদি আমার ভাইকে দেন! সেও বেশ যোগ্য লোক।"

বিদ্যাসাগরের সরলতা দেখে মার্শাল সাহেব মুগ্ধ হলেন। তিনি যা বললেন তাই হলো। তাঁর ভাই দীনবন্ধুকে তিনি হেড পণ্ডিতের চাকরী দিলেন আর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হয়ে চলে গেলেন। মাইনে অবশ্য সেই পঞ্চাশ টাকা। তবে এই পদের সম্মান ও দায়িত্ব অনেক বেশী।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের উন্নতির জন্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজ ছিল নামেই মাত্র কলেজ! আসলে পাকা বাড়িতে একটা টোল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পণ্ডিতেরা আসতেন যাঁর যখন খুশি, আবার চলেও যেতেন নিজেদের ইচ্ছামত। এ-বিষয়ে বাঁধাধরা কোনো নিয়-কানুন কিছুই ছিল না। তার ওপর পণ্ডিতেরা কলেজে এসে প্রায়ই চেয়ারে বসে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। আর ছাত্ররা তালপাখা দিয়ে তাঁদের বাতাস করতো। তারপর বেশ এক ঘুম দিয়ে পণ্ডিতমশাইরা ছাত্রদের পড়াতে বসতেন।

বিদ্যাসাগর প্রথমেই এই দুটো বিষয়ের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। পণ্ডিতদের ডেকে বললেন—"এখন থেকে আপনারা ঠিক নিয়মমত কলেজে আসবেন। ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আসতে হবে আর বিকালে পাঁচটার আগে কেউ যেতে পাবেন না।"

ছাত্রদের জন্যেও সেই ব্যবস্থা হলো—তাদেরও কলেজে আসা-যাওয়ার সময় ঠিক করে দিলেন। আর তারা যে নিজেদের খুশিমত কলেজ থেকে যখন-তখন বিনা পাশে বাইরে চলে যেত, তাও তিনি বন্ধ করলেন। কাঠের ওপর লেখা পাশ নিয়ে বাইরে যাবার নিয়ম হলো। সেই পাশ না দেখাতে পারলে দারওয়ান কোন ছাত্রকে ছাড়ত না। এতদিন বাদে যেন একটা নিয়মের রাজত্ব দেখা গেল এই শিক্ষায়তনে। তখন থেকে সবই সুশৃঙ্খল, সবই নিয়ম মাফিক চলতে লাগল।

পরীক্ষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর কিছু নতুন নিয়ম করলেন। তার ফলে আগের বছরের চেয়ে সে বছর পরীক্ষার ফল ভালোই হলো। শিক্ষা-বিভাগের কর্তা ময়েট সাহেব খুব খুশী হলেন তাঁর কাজ দেখে। আগে ব্যাকরণ পড়তেই ছেলেদের চার-পাঁচ বছর লাগতো, অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট হতো। বিদ্যাসাগর সরলভাবে ব্যাকরণ শেখাবার নিয়ম চালু করলেন।

আগে সংস্কৃত কলেজে ছেলেদের অঙ্ক শেখাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বিদ্যাসাগর সাহিত্যের ক্লাসে অঙ্ক শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে নানা দিকে দিন দিন কলেজের উন্নতি হতে লাগলো। সকলের মুখেই পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতির কথা। তিনি সহকারী সম্পাদক হবার পর থেকে সংস্কৃত কলেজের চেহারা যেন একেবারে বদলে গেলো। কর্তৃপক্ষ তাঁর যোগ্যতার প্রশংসা করলেন।

এই সময়ে তাঁর জীবনে একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে দেশশুদ্ধ লোক বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মান-বোধ ও তেজস্বিতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলো। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল, সেই ঘটনার পর থেকে লোকে বুঝলো যে, বিদ্যাসাগরের নির্ভীক হৃদয় কোথাও কারো কাছে নত হবার নয়।

কিছুদিন বাদে কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলো। ময়েট সাহেব ও অধ্যাপক রসময় বাবুর ইচ্ছা বিদ্যাসাগর ঐ চাকরীটা গ্রহণ করেন। মাইনেও বেশী। কিন্তু তাঁর কাছে মাইনেই বড় ছিল না। কলেজের উন্নতি কিসে হয়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। অধ্যাপকের কাজ নিলে, কলেজের উন্নতির জন্যে কিছু করার সুযোগ পাবেন না ভেবেই বিদ্যাসাগর ঐ চাকরীটা নিতে রাজী হলেন না।

"তবে কাকে সাহিত্যের অধ্যাপক করা যায়?"—জিজ্ঞাসা করলেন ময়েট সাহেব।

"এই পদের জন্য একমাত্র যোগ্য লোক মদনমোহন তর্কালঙ্কার।"
—বললেন বিদ্যাসাগর।

"তিনি তো কৃষ্ণনগর কলেজে কাজ করছেন। তার চেয়ে এখন আপাততঃ যিনি ঐ পদে কাজ চালাচ্ছেন সেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে এই কাজটা দিলে কেমন হয়?"

"আমার তাতে মত নেই।"

"কেন?"

"তিনি বুড়ো হয়েছেন, বেশীর ভাগ সময় চেয়ারে বসে ঘুমান। তাঁর অধ্যাপনায় ছেলেদের কোনো উন্নতি হবে না। সেইজন্য আমার মতে মদনমোহনই যোগ্য লোক।"—বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের কথাই শেষ পর্যন্ত থাকল। মদনমোহনকেই সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হলো। এই মদনমোহন ছিলেন তাঁর সহপাঠী এক বন্ধু। বন্ধুর একটু উপকার করতে পেরে বিদ্যাসাগর মনে মনে খুব তৃপ্তিবোধ করলেন। ইচ্ছে করলে ঐ বেশী টাকার চাকরীটা তিনি নিজেই নিতে পারতেন; কিন্তু বন্ধুর জন্যে এই স্বার্থত্যাগ—এ একমাত্র বিদ্যাসাগরের মতো উন্নত-চরিত্রের লোকের পক্ষেই সম্ভব।

দিন যায়। বিদ্যাসাগর নিয়মিতভাবে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু বেশীদিন এ-কাজ করা তাঁর পোষাল না। একে তো তিনি ছিলেন ভারী তেজী লোক। তার ওপর কারো খোশামোদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উচিত কথা বলতে কখনও তিনি ভয় পেতেন না। কখনও কারো কাছে মাথা নতও করতেন না। তাছাড়া কোনো রকম অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না একেবারেই।

এইসব জন্য ক্রমে কলেজের কাজকর্ম নিয়ে রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হতে লাগল। তিনি এক রকম করতে চান। আর সম্পাদক হিসেবে রসময় বাবু তার উল্টো কথা বলেন। এইভাবে

ঝগড়াঝাঁটি করে কাজ করা চলে না। তাই শেষে এক রকম বিরক্ত হয়েই বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিলেন। অনেকে বারণ করলেন, তবু কিছুতেই কারো কথা শুনলেন না তিনি। এমন কি ময়েট সাহেব পর্যন্ত কতো বোঝালেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জেদ বড় ভীষণ জেদ—ঠিক এঁড়ে বাছুরের মতই। বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত কাজ ছেড়েই দিলেন।

বন্ধুরা শুনে বিস্মিত হলেন। কেউ বা দুঃখিত হলেন। একজন বললেন—"চাকরী তো ছেড়ে দিলে রাগ করে। খুব বাহাদুরি দেখালে, কিন্তু এখন খাবে কি ?"

তাদের মুখের ওপর জবাব দিলেন বিদ্যাসাগর—"কেন, আলু পটল বেচবো, মুদির দোকান করবো, তবু যে-কাজে ইজ্জৎ হানি হয়, তেমন চাকরী করবো না।"

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে এমন মনের বল কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে ?

এমনি অক্ষয় মনোবলের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর।

এমনি অজেয় মনোবলের পরিচয় আছে তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে, প্রত্যেকটি কথায়।

এটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে।

তাই না সেদিন তিনি সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় হতে পেরেছিলেন।

॥ নয় ॥

"পণ্ডিত, আপনি নাকি সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন ? একদিন সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতি— আপনার বিশ্বস্ত মার্শাল।"

মার্শাল সাহেব চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে।

তাঁর একজন পরম শুভার্থী ছিলেন মার্শাল সাহেব। লোকমুখে তিনি কিভাবে জানতে পেরেছেন যে, বিদ্যাসাগর কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক সেই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের কাজটা সবে খালি হয়েছে। ঐ পদে যিনি কাজ করছিলেন, সেই দুর্গাচরণ বাবু এর মধ্যে ডাক্তারী পাশ করে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। তাই মার্শাল সাহেব তখুনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে জানালেন।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মার্শাল সাহেব তাঁকে হেড রাইটারের কাজটা নেবার জন্যে আবার অনুরোধ করলেন। মাইনে আশি টাকা। অমনি তাঁর কথামত বিদ্যাসাগর আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করতে লাগলেন। চাকরী ছেড়ে দেবার পর তাঁর একটা মহা দুশ্চিন্তা ছিল মনে। দুশ্চিন্তা অবশ্য তাঁর নিজের জন্য নয়। তখন অনেকগুলো লোকের খাওয়া-পরার ভার ছিল তাঁর ওপর। প্রায় জন কুড়ি গরীব ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে পড়াশুনা করতো। এই অবস্থাতেও তিনি কাউকে চলে যেতে বললেন নি। বরং নিজে ধার করে তাদের খরচ চালাতেন। এবার বিদ্যাসাগর নিশ্চিন্ত হলেন।

অবশ্য এই হেড রাইটারের কাজ তাঁকে আর বেশীদিন করতে হলো না।

এই সময় থেকেই বিদ্যাসাগরের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে সংস্কৃত কলেজের চাকরী তিনি বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইখান থেকেই তাঁর আবার ডাক এলো। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের খুব অসুখ, কলকাতার জলবায়ু তাঁর সহ্য হচ্ছে না। তিনি মুর্শিদাবাদে

জজ-পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন। সেইজন্য সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদের চাকরীটা খালি হলো। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে বেশী মাইনে দিয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে রাজী হন নি। তিনি লিখে পাঠালেন যে, কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় যদি তাঁকে অধ্যক্ষের মতো ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলেই তিনি ঐ চাকরী নিতে পারেন। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের কথাতেই রাজী হলেন।

বিদ্যাসাগর এখন সংস্কৃত কলেজে আবার সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে এলেন।

কিছুদিন পরে রসময় দত্ত চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষ তখন কি করলে ভবিষ্যতে কলেজের উন্নতি হতে পারে, সেই বিষয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করবার জন্যে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর অনেক যত্ন করে সেই রিপোর্ট তৈরি করলেন। সেই রিপোর্ট পড়ে শিক্ষা সমিতির কর্তারা খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তাঁরা বিদ্যাসাগরকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। মাইনে হলো দেড়শো টাকা। কলেজের সর্বময় কর্তা হয়ে তিনি এমন সব নিয়ম-কানুন করলেন, যা আগে কখনও ছিল না। আগে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের ছেলেরা এখানে পড়তে পারতো। তিনি নিয়ম করলেন যে, এখন থেকে সকল জাতের লোকই সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে। অনেকে এই নিয়মটা পছন্দ করলো না। অনেকে এর জন্যে তাঁর নিন্দে করতে লাগলো। কেউ বললে যে, বিদ্যাসাগর ইংরেজী-পড়া পণ্ডিত কিনা, তাই তাঁর জাত-বিচার নেই। তবুও এসব কথায় তিনি কান দিলেন না। ছাত্রদের আগে মাইনে দেবার নিয়ম ছিল না। বিদ্যাসাগর মাইনের নতুন ব্যবস্থা করলেন।

যেসব ছাত্র সংস্কৃত পড়তো তাদের প্রথম কয়েক বছর ব্যাকরণের ক্লাসেই কেটে যেতো। ব্যাকরণের ক্লাস থেকেই অনেকে ফিরে আসতো। এক পাণিনি আর ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ বুঝতেই তাদের চার-পাঁচ বছর লাগতো। এর ফলে অনেকেই সংস্কৃতের দরজা থেকেই ফিরে আসতো। বিদ্যাসাগর তাদের জন্য পথ সুগম করে দিলেন।

কঠিন ব্যাকরণ ঢেলে নতুন করে সাজালেন—লিখলেন উপক্রমণিকা। এই বই পড়ে ব্যাকরণে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে ছাত্রদের কোনো অসুবিধা হতো না। এই উপক্রমণিকা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ দান হলো। এর জন্যেও গোঁড়া পণ্ডিতেরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন।

ব্যাকরণ পাঠ করে ছেলেরা সাহিত্যের ক্লাসে ভর্তি হতো। সেখানে এসে প্রথমেই তাদের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি শক্ত শক্ত বই পড়তে হতো। এসব বই পড়তে গিয়ে তাদের বৃথা সময় নষ্ট হতো। অথচ অল্প বয়সের ছাত্ররা এসব কঠিন বই কিছুই বুঝতে পারত না। এই অভাব দূর করার জন্যে বিদ্যাসাগর সোজা সোজা সংস্কৃত বই লিখলেন। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ আর মহাভারত থেকে বেছে বেছে গল্প সংকলন করলেন তিনি। তাঁর এই বইয়ের নাম ঋজুপাঠ। সেই থেকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ পড়ানো হতে লাগলো। ছেলেদের পক্ষে এতে সংস্কৃত শিক্ষা করা খুব সহজ হলো।

এইভাবে কলেজের উন্নতি করার জন্যে কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের মাইনে দেড়শো থেকে তিনশো টাকা করে দিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন শুরু হয়। তখন জেলায় জেলায় এতো স্কুল ছিল না। শিক্ষা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট তখন একজন মহামতি ইংরেজ। তাঁর নাম ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। কলকাতার বেথুন কলেজ আজো এঁর স্মৃতি বহন করছে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুন সাহেবের আলাপ হলো। তিনি বুঝলেন যে, এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে এই পণ্ডিতের মতো

উপযুক্ত লোক আর দ্বিতীয় কেউ নেই। তখন জেলায় জেলায় মডেল স্কুল খোলা শুরু হয়েছে। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া আর মেদিনীপুর—এই চার জেলায় গ্রামে গ্রামে স্কুল বসাবার জন্যে আর সেইসব স্কুলের দেখাশুনা করবার জন্যে বিদ্যাসাগরকে ইন্‌সপেক্টার নিযুক্ত করা হলো। এই অতিরিক্ত কাজের জন্যে তাঁকে আলাদা দুশো টাকা করে মাইনে দেওয়া হতে লাগলো। কলেজের মাইনে আর এই মাইনে মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের এখন মাসিক রোজগার দাঁড়াল পাঁচ শো টাকা। বিদ্যাসাগর এখন একজন বিখ্যাত লোক।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। তিনি একদিন কলেজ দেখতে এসে সরল ও অনাড়ম্বর পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে দেখে অবাক হলেন। তারপর শিক্ষা বিষয়ে একটু আলাপ করেই বুঝতে পারলেন যে, এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে প্রকৃতই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কলকাতার গণ্যমান্য লোকেরাও তখন এই থান ধুতি-পরা আর চটিজুতো পায়ে-দেওয়া পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। জমিদার, রাজা-মহারাজা, ধনী, বিদ্বান সকলেই এখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ হন—শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজই তখন হতো না।

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন যে, দেশের যা নিজস্ব জিনিস, সেই সংস্কৃত থাকুক। তবে নতুন যুগ এসেছে, কাজেই তখন ইংরেজী শিক্ষাকে অবহেলা করলে চলবে না। ইংরেজী শিক্ষাও দরকার। পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ছেলেদের এখন ইংরেজী লেখাপড়া শেখা যে খুবই দরকার—এই কথা তিনি মনে-প্রাণে স্বীকার করতেন। নিজে তিনি টুলো পণ্ডিত, আজীবন সংস্কৃতের চর্চা করেছেন, অথচ তখনকার দিনের হিন্দু কলেজে-পড়া অন্যান্য বাঙালিদের মতো বিদ্যাসাগর যুগের হাওয়ার সঙ্গে একেবারে গা ভাসিয়ে দেন নি। তিনি আজীবন ধুতি-চাদর আর তালতলার চটি বজায় রেখেই যুগধর্ম পালন করেছিলেন। এইখানেই ছিল তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব।

আগে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী পড়াবার বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়ম ছিল না; যার ইচ্ছা পড়তো, যার ইচ্ছা হতো না সে পড়তো না। তখন হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ এই দুটি শিক্ষায়তনই পাশাপাশি ছিল। হিন্দু কলেজেই ইংরেজী পড়ানো হতো রীতিমতো ভাবে। অধ্যক্ষ হবার পর বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, তাঁর কলেজের ছাত্ররা যদি নিয়ম মতো ইংরেজী শিখতে পারে, তাহলে হিন্দু কলেজের পাশ-করা ছাত্রদের মতো, সংস্কৃত কলেজের পাশ-করা ছেলেরাও জীবনে উন্নতি করতে পারবে। এইজন্যে তিনি ইংরেজী শিখবার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করে দিলেন এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে ইংরেজীর প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

বিদ্যাসাগরের এখন কত কাজ। সংস্কৃত কলেজ, চারটি জেলার ইন্‌সপেক্টারের কাজ আবার নর্মাল স্কুল দেখাশুনা করা। এর ওপর নিজের বই লেখার কাজ তো আছেই। এইভাবে যখন গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার হতে লাগলো, নতুন নতুন স্কুল হতে লাগলো, তখন একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। এইসব স্কুলে পড়াবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় কোথায়? অমনি স্থাপিত হলো একটি নর্মাল স্কুল এবং এই স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁর ওপরেই দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগর এই নর্মাল স্কুলের জন্য উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তকে নিযুক্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দুজনেই তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ তত্ত্বাবোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা।

বিদ্যাসাগরকে এখন দেশময় কত লোক খাতির করে—সাহেব সুবো থেকে আরম্ভ করে লাট সাহেবের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সুযোগ সুবিধা তাঁর কতো। অন্য কেউ হলে নিজের জন্য অনেক কিছু করে নিতে পারতেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্লোভ ব্রাহ্মণ। স্বার্থপরতা তাঁর স্বভাবের মধ্যে একেবারেই ছিল না। তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের তিনিই প্রথম

প্রিন্সিপাল, তার ওপর চারটে জেলার স্কুল-ইন্‌সপেক্টর তিনি—এ কি কম গৌরবের কথা ছিল তাঁর পক্ষে! দেশের রাজা-মহারাজা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এ-অবস্থায় ইচ্ছা করলেই তখন তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করে নিতে পারতেন। কিন্তু ধুতি চাদর আর চটি জুতোতেই তিনি আজীবন সন্তুষ্ট রইলেন। নিজের সুখ-সম্পদের দিকে, বিষয়-বৈভবের দিকে তাঁর মন গেল না। একদিনের জন্যেও নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করলেন না—নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিলেন দেশের কাজে, দশের সেবায়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, পরের উপকার করা আর জ্ঞান-বিতরণ করা—এই সবই হয়ে দাঁড়াল সেই নির্লোভ ব্রাহ্মণের জীবনের একমাত্র ব্রত।

মান-সম্মানের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে থেকেও বিদ্যাসাগর দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সেবাই ছিল তাঁর ধর্ম। জীবনের সকল অবস্থায় তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই ধর্ম পালন করে গিয়েছেন—এর জন্যে তাঁর ক্লান্তি ছিল না কোনো দিন।

একদিন সকাল বেলায় এক মেথর কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো—"মেথরাণীর কলেরা হয়েছে, বাবা।" বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারলেন না। কলেরার ওষুধের একটা বাক্স হাতে করে তিনি সেই মেথরের অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন পর্ণকুটীরে এলেন; সারাদিন সেই মল-মূত্রের মধ্যে বসে থেকে রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করলেন। রোগীকে যখন নিরাপদ বলে মনে করলেন, তখন উঠে তিনি বাড়ি ফিরলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

এই দয়া-দাক্ষিণ্য, এই স্নেহ-মমতা সেদিন বাংলাদেশে একমাত্র এই ব্রাহ্মণের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল। তাঁর কাছে গরীব আর বড়লোকের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না। এই গুণেই তিনি বাঙালির কাছে চির পূজ্য, চির স্মরণীয় হয়েছেন। নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর চরিত্রের এই মহত্বের জন্যেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে পেরেছিলেন।

ইনস্‌পেক্টর হিসাবে বিদ্যাসাগর পাল্কী চড়ে জেলায় জেলায় ঘুরে স্কুলের তদারক করতেন। সেই সময় দেশের অনেক ধনীলোকও তাঁর

কাজের সহায়তা করতেন। অনেক জমিদার এই সুযোগে মুক্ত হস্তে কিছু কিছু দান করতেও থাকেন।

কোথাও স্কুল খোলা হবে শুনলেই বিদ্যাসাগর সেখানে ছুটে যেতেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিতেন। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এইভাবে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর—এই চার জেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি অসংখ্য স্কুল খুলে দিলেন। এতে ছেলেদের লেখাপড়ার কতো যে সুবিধা হলো, তা বলে শেষ করা যায় না। সেদিন বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে জ্ঞান-ভগীরথের কাজ করেছিলেন। এই-ভাবেই তিনি সারা দেশে শিক্ষার ধারাকে বইয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামের জমিদারদের তিনি বলতেন—"পুকুর বা অতিথিশালার মতো দেশে একটা করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করুন আপনারা। এতে আপনাদের যেমন পুণ্য হবে, দেশেরও তেমনি উপকার হবে।"

শুধু যে ছেলেদের শিক্ষার জন্যেই বিদ্যাসাগর ভাবতেন, তা নয়। মেয়েদের শিক্ষার জন্যেও তিনি চিন্তা করতেন। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই লেখাপড়া শেখা দরকার, নইলে জাতির উন্নতি হবে কিসে? এই কথা বলতেন তিনি। আগে যে বেথুন সাহেবের নাম করেছি, সেই মহাপ্রাণ বেথুন সাহেব এদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। বেথুন সাহেব তাঁর কাজের জন্য বিদ্যাসাগরের খুব সাহায্য পেয়েছিলেন।

এইসব কারণে ছোটলাট সাহেবও বিদ্যাসাগরকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় ঠিক হলো যে, মেয়েদের জন্যও স্কুল খোলা হবে। মেয়েরা সবাই যাতে বিনা মাইনেতে পড়তে পায়, সেই ব্যবস্থা হলো। এমন কি তাদের পড়ার বই, লেখার কাগজ, শ্লেট, পেন্‌সিল সবই কিনে দেওয়া হতো। এর সব খরচই যে সরকার থেকে দেওয়া হতো তা নয়, অনেক সময় বিদ্যাসাগর নিজেই এইসব খরচ বহন করতেন।

বেথুন সাহেবের গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না।

বিদ্যাসাগর নিজেও বলতেন—"এমন মহৎ ইংরেজ আর ছুটি দেখি নি।" সত্যি তাই। বিদেশী হলে কি হয়, বাঙালি মেয়েদের ইনি নিজের মেয়ের মতো দেখতেন। তিনি নিজেও একটি স্কুল করেন মেয়েদের জন্যে। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা কেউ ভাবতে পারতো না, তাই প্রথম প্রথম স্কুলে মেয়ে পাঠাতে অনেকেই চায় নি। আবার যেসব বাড়ির মেয়েরা স্কুলে পড়তে যেতো তাদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলতো। কোনো একটা নতুন ব্যবস্থা যখনই দেশের মধ্যে আসে, তখন সবদেশেই প্রথম প্রথম এরকম হয়ে থাকে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বাঙালী হিসাবে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তার ফলে দেশের লোকের কাছে তাঁর কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। কিন্তু তিনি তা কখনও গ্রাহ্য করতেন না।

বেথুন সাহেব যখন নিজের টাকা দিয়ে কলকাতায় হিন্দু মেয়েদের পড়বার জন্য একটা স্কুল করে দিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর কাজে সাহায্য করতে সকলের আগে এগিয়ে এলেন। কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে সইল না—স্কুল প্রতিষ্ঠা হবার অল্পদিন পরেই বেথুন সাহেব মারা যান। এমন একজন বন্ধুকে হারিয়ে বিদ্যাসাগর খুব শোক পেয়েছিলেন। বেথুন সাহেব মারা গেলে তাঁর স্কুলের সমস্ত কাজের ভার বিদ্যাসাগর নিজে গ্রহণ করেছিলেন। অনেকদিন ধরে তিনি বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে এদেশে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের নাম এক-সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। বেথুন সাহেব তখন শিক্ষা-সমিতির প্রেসিডেন্ট। তবু তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠিক যেন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতেন, এবং বন্ধুর মতো তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ চাইতেন। বেথুন স্কুল খোলার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ভিন্ন আরো যে দু'তিনজন বাঙালি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম করতে হয়।

তর্কালঙ্কার মশাইয়ের দুই মেয়ে—ভুবনমালা ও কুন্দমালাই বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী।

এতো সব করেও জন্মস্থান বীরসিংহের কথা কিন্তু বিদ্যাসাগর কোন সময়ের জন্য ভোলেন নি। ছেলেবেলা থেকে, এমন কি সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়েও জলপানীর টাকা জমিয়ে তিনি দেশের টোলের জন্য কিছু পুঁথি ও একটু জমি কিনেছিলেন। একবার দেশে এসে বাবাকে বললেন—"টোল করে আর দরকার নেই বাবা, এখন ইংরেজী শিক্ষার যুগ। একটা ইংরেজী স্কুল খুলি এখানে। আপনি কি বলেন ?"

ঠাকুরদাস ছেলের কথায় রাজী হলেন। স্কুলের জন্যে জমি দেখা হলো। সেই জমির ওপরে পাকা কোঠা উঠলো। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে এই স্কুল-বাড়ীর জন্যে ইট গেথেছিলেন। একদিকে বাড়ী তৈরী হতে লাগলো, অন্যদিকে ছেলে ভর্তি হতে লাগলো। প্রায় একশো ছেলে ভর্তি হলো। এইভাবেই বীরসিংহে মায়ের নামে তিনি মেয়েদের জন্যেও একটা স্কুল খুলেছিলেন।

শুধু এই করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। দেশের দরিদ্র চাষা-ভূষোর ছেলেরা যাতে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, সেজন্যে তিনি একটা নাইট স্কুল খুললেন। এখানে শুধু চাষীদের ছেলেরাই পড়তো। এই তিনটে স্কুলই ছিল অবৈতনিক। ছেলেরা ও মেয়েরা বিনা মাইনে ও বিনা খরচে লেখাপড়া শিখতে লাগল। এর সব খরচই ছিল বিদ্যাসাগরের একলার। এমন কি শিক্ষকদের মাইনে পর্যন্ত তিনি দিতেন।

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর সেদিন এইভাবেই দেশে জ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের জন্য অকাতরে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছিলেন। আজ আমাদের সরকার শিক্ষার জন্য যা করছেন ও ভাবছেন, কত যুগ আগে এই মহাপুরুষ তা ভাবতেন এবং কাজেও পরিণত করেছিলেন, সেসব কথা ভাবলে আপনা থেকেই মন তাঁর চরণে শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

॥ দশ ॥

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিদ্যাসাগর শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তখন যেমন এখনকার মতো অসংখ্য স্কুল ছিল না, তেমনি তখন ছেলেদের পড়ার জন্যে পাঠ্য পুস্তকের অভাবও ছিল খুব বেশী। বিদ্যাসাগরকে এদিকেও মন দিতে হলো। ছেলে-মেয়েদের পড়বার জন্যে বই লিখতে হলো। ছোটদের ও বড়দের জন্যে তিনি বাংলাভাষায় ভালো ভালো বই লিখেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী যে বইখানা লিখেছিলেন, সেখানা হলো অ আ ক খ শেখার জন্য একখানা বর্ণপরিচয়। এই বর্ণপরিচয় বিদ্যাসাগরের প্রতিভার এক আশ্চর্য কীর্তি। তখন এ-ধরণের কোনো ভালো বই ছিল না। একখানা যা ছিল তার নাম শিশুবোধ। সেকেলে ধরণের বই, তবুও তাই দেখে কোনোমতে অক্ষর পরিচয় হতো। এই বইখানার অসুবিধা ছিল অনেক। সেইজন্য বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সহজের উপর এই বইখানা লিখলেন। এর প্রথমভাগ দেখে ছেলেদের সহজেই অক্ষর পরিচয় হতো আর দ্বিতীয় ভাগ থেকে তারা শিখতো বানান।

বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনিও তখনকার দিনের নামকরা শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজীতে একজন সুপণ্ডিত। প্যারীবাবুর বৈঠকখানায় বিদ্যাসাগর ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে মজলিস বসতো। এই মজলিসে তাস পাশা বা দাবা খেলা হতো না কিম্বা কোন রকম খোসগল্প হতো না। এখানে সবাই মিলে শুধু দেশের কথা চিন্তা করতেন। কিসে দেশের ছেলে-মেয়েদের উন্নতি হবে, এইসব কথাই তাঁরা আলোচনা করতেন। একদিনকার মজলিসে কথা উঠল এখন ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্যে কি কি ভালো ব্যবস্থা করা যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে প্যারীচরণ সরকার ইংরেজী বর্ণমালা থেকে শুরু করে ছেলেদের প্রথমপাঠ্য কয়েকখানা ইংরেজী বই লিখবেন; আর বিদ্যাসাগর লিখবেন বাংলা বর্ণপরিচয় ও কয়েকখানা সহজ প্রথম পাঠ বই।

তখন বিদ্যাসাগরের কত কাজ। তবু সেই কাজের মধ্যেই একদিন স্কুল দেখতে বের হয়ে পথে পাল্কিতে বসে বসেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ রচনা করলেন। আর প্যারিচরণ লিখলেন ইংরেজী ফার্স্ট বুক অব্ রীডিং। এইভাবেই সেদিন এই প্রসিদ্ধ বই দুখানার জন্ম হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় একশো বছর আগে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে আজ অবধি একই ভাবে চলে আসছে। এখন অ আ ক খ শেখবার মত কত রং-বেরঙের বই বাজারে বেরিয়েছে, তবুও বিদ্যাসাগরের সেই বর্ণপরিচয় আজো শ্রেষ্ঠ।

তখনকার দিনে ছেলেদের পড়বার জন্যে ভালো বাংলা বই ছিল না। ফলে ছেলেদের বাংলা পড়াই হতো না। এই অভাব দূর করবার জন্যে বিদ্যাসাগর কলম ধরলেন। লিখলেন কথামালা, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, উপক্রমণিকা প্রভৃতি কয়েকখানা বই; আর বড়দের জন্যে লিখলেন বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি বই। এইসব বই পড়লে সত্যিই দেখা যায় কিভাবে সেদিন বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন করে গিয়েছিলেন।

তাঁর আগে যে সব বাংলা বই ছিল, সেগুলো নামেই বাংলা কিন্তু আসলে তা বাংলা হরফে ছাপা সংস্কৃত ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন দুর্বোধ্য তেমনি খট-মটে। বিদ্যাসাগর তাই বাংলা ভাষা তৈরি করার কাজে এমনভাবে মন দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই প্রথম এই ভাষা নতুন রূপ নিলো। তিনি যদি একাজে হাত না দিতেন তাহলে বাংলা ভাষার উন্নতি হতে আরো দেরী হতো। যে বাংলা ভাষা এখন আমরা পড়ি আর লিখি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরই তার গোড়া পত্তন করে দিয়ে যান। এইজন্যই বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের জনক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে এই কথা একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে বিদ্যাসাগরের লেখাপড়ার চর্চা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় নি মোটেই। সত্যিকথা বলতে কি, তিনি আজীবন ছাত্রই ছিলেন। অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপস্যা। বিদ্যালাভের প্রবল আকাঙ্খা ছিল তাঁর সারা জীবন। এখনকার ছেলেরা যেমন স্কুল বা কলেজে পরীক্ষায় পাশ করার পর বিদ্যার চর্চা একরকম ছেড়েই দেয়। কিন্তু তিনি সেরকম ছিলেন না। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা অভ্যাস তাঁর কখনো ছিল না। বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল তাঁর। সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, প্রভৃতি নানা বইতে সেই লাইব্রেরী ভর্তি ছিল। কি সংস্কৃত, কি ইংরেজী, নতুন যে-কোন বই বেরুবা মাত্র তখনি তিনি সংগ্রহ করে আনতেন এবং সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। বইয়ের যত্নও করতেন তিনি খুব। অতি সুন্দর করে সে-সব বই তিনি বাঁধিয়ে রাখতেন। তাছাড়া তাঁর বইয়ের আলমারিতে কখনো ধুলো জমতে দেখা যেতো না। লোকে বলতো, বামুনের বই সম্বন্ধে একটা বাতিক আছে। কিন্তু বিদ্যোৎসাহীরা জানতেন, এই-ই তাঁর প্রকৃত প্রাণ। তিনি বই কি রকম ভালোবাসতেন সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

একজন লোক একবার বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। খবর পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগর ভদ্রলোকটিকে ওপরে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে আনতে বললেন। বিদ্যাসাগর তখন আলমারির তাক থেকে মোটা মোটা বইগুলো নামিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। ভেতরে ঢুকেই আলমারি ভর্তি এত সুন্দর সুন্দর চক্‌চকে ঝকঝকে বই দেখে অপলক নয়নে কিছুক্ষণ ভদ্রলোক তাকিয়ে দেখেন। মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতির পাশেই রয়েছেন, সেক্সপিয়র, মিলটন, স্কট, মিল ও সোন্সার। প্রত্যেকখানা বইতে সোনার অক্ষরে নাম লেখা আর ঝক্‌ঝকে বাঁধাই। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

"আচ্ছা এ-সব বই আপনি পড়েন?"—জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোকটি।

"না পড়লে, শুধু কি সাজাবার জন্যে রেখেছি মনে করেন ?" —জবাব দিলেন বিদ্যাসাগর।

"এত বেশী দাম দিয়ে বইগুলো বাঁধানো কি ভালো ?"

"কেন ? দোষ কি তাতে ?"

"ওই টাকায় দেশের অনেক উপকার হতে পারতো।"

বিদ্যাসাগর কিছু বললেন না। কিন্তু তাকিয়ে দেখলেন ভদ্রলোকের গায়ে একটা দামী শাল রয়েছে। অমনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—"মশাইয়ের এই শাল জোড়াটির দাম কত ?"

ভদ্রলোক পরম আপ্যায়িক হয়ে বলেন—"এর দাম পাঁচশো টাকা।"

"কেন পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত কাটে, তবে এত টাকার শাল গায়ে দেবার দরকার কি ? এ টাকাতেও তো অনেকের উপকার হতে পারতো। এই দেখুন না, আমি তো একখানা মোটা চাদর গায়ে দিয়েই শীত কাটিয়ে দিই।"

এইবার সত্যিই ভদ্রলোক লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

সাদা ধুতি, সাদা চাদর আর তালতলার চটি এই ছিল বিদ্যাসাগরের পোষাক।

এই পোষাকেই তিনি লাট দরবারে যেতেন, রাজা মহারাজার বাড়িতে যেতেন আর এই পোষাকেই তিনি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল-গিরি করতেন, মফঃস্বলে স্কুল দেখতেও যেতেন। এই পোষাকের ভেতর দিয়েই ফুটে বেরুতো তাঁর স্বদেশপ্রীতি আর ব্রহ্মণ্য তেজ। একেবারে সেযুগের বাংলাদেশের দেশী মানুষ ছিলেন তিনি। তখনকার দিনে এসব জিনিষ বড় একটা কেউ কল্পনা করতে পারতো না। ইংরেজী পড়ে তখন অধিকাংশ বাঙালিই কিছুটা পোষাকে পরিচ্ছদে সাহেবদের অনুকরণ করতে শিখেছে, নকল সাহেব সাজতে শিখেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর স্বজাত্যবোধ এতটুকু হারান নি। ধুতি চাদর আর চটি জুতো পরেই তিনি দিগ্বিজয় করেছিলেন।

তাঁর পোষাকের আড়ম্বর না থাকার দরুন অনেক জায়গায় অনেক মজার ব্যাপারও ঘটতো।

একবার তিনি স্কুল দেখবার জন্যে হুগলী জেলায় এক পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলেন। তখন বিদ্যাসাগরের চারদিকে খুব নাম ডাক। যেখানেই তিনি যান সবাই তাঁকে একটি বার দেখতে চায়। হুগলী জেলায় সেই গাঁয়ের লোক যখন শুনলো বিদ্যাসাগর আসছেন, তখন সেখানকার ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে—সবাই তাঁকে দেখবার জন্যে দলে দলে ছুটে এলো। সকাল থেকেই স্কুল-বাড়ির কাছে ভিড় জম্‌তে শুরু করেছে। বিদ্যাসাগরের পাল্কী এসে পৌঁছতে দেরী হচ্ছিল, তবু যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা তেমনি একভাবে সেখানে দাঁড়িয়েই থাকল—বিদ্যাসাগরকে দেখবার জন্য তাদের এমনি ছিল আগ্রহ। কিছুক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগরের পাল্কী এসে থামলো স্কুল-বাড়ির কাছে। অমনি চারদিকে রব উঠলো—"বিদ্যাসাগর এসেছেন! বিদ্যাসাগর এসেছেন!"

সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। সামনে দিয়ে বিদ্যাসাগর চলে গেলেন, কিন্তু তিনি তবু জিজ্ঞাসা করেন—"কই গো, বিদ্যাসাগর কোথায়?" একজন বললে—"ওই যে বিদ্যাসাগর।" বৃদ্ধা মহিলা তখন চোখ দুটি কপালে তুলে বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে, ইনিই বিদ্যাসাগর। শেষে বলেন—"ও আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর-গায়ে একটা উড়ে বেহারা দেখবার জন্যে রোদে ভাজা ভাজা হলাম। না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা-চাপকাণ।"

"না থাকুক! তবু এই চটি ও চাদরে তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন, অনেক চোগাচাপকাণধারী লোক তা কল্পনাও করতে পারে না।"

হ্যালিডে সাহেব তখন বাংলার ছোটলাট।

বিদ্যাসাগরকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং সকল বিষয়ে তাঁর

পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ছোটলাট তখন থাকতেন বেলভেডিয়ারে। একবার হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন— "পণ্ডিত, আপনাকে একটা অনুরোধ করব।"

"কিসের অনুরোধ ?"

"আমার ভারি ইচ্ছে যে, আপনি আর পাঁচজনের মতো চোগা-চাপকাণ পরে এখানে আসেন।"

বিদ্যাসাগর ছোটলাটের কথা রাখলেন। পেন্টুলুন, চোগাচাপ-কাণ তৈরী করালেন। আর ঐ সঙ্গে একটা পাগড়িও কিনলেন। সেই অদ্ভুত পোষাক পরে দু'তিন দিন বেলভেডিয়ারে গেলেন। চারদিনের দিন সেই বেশে গিয়ে বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে বললেন—"আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।"

"কেন পণ্ডিত, কি হয়েছে ?"—চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন হ্যালিডে সাহেব।

"সঙ্‌ সেজে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব ।"

"কেন সবাই তো আসে।"

"অন্য লোকের কথা আলদা। আমাকে দিয়ে একাজ হবে না।"

স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের আসল পরিচয় পেয়ে হ্যালিডে সাহেব তখন তাঁকে বললেন—"আচ্ছা, যে পোষাকে এলে আপনার সুবিধা হয়, আপনি সেই পোষাকেই আসবেন।"

বিদ্যাসাগর নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর চটি জুতো, থান ধুতি আর চাদরের মর্যাদা বজায় থাকলো দেখে তিনি মনে মনে খুব খুশী বোধ করলেন। ইংরেজী লেখাপড়া শিখে, ইংরেজদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এবং ইংরেজের চাকরী করেও দেশী পোষাক ও দেশীয় আচার-ব্যবহার বিদ্যাসাগর কোনোদিন পরিত্যাগ করেন নি। এইজন্যেই তিনি চির-বরণীয় ও চির-স্মরণীয়।

॥ এগার ॥

ডাব্লিউ গর্ডন ইয়ং।

এই তরুণ সিভিলিয়ান তখন শিক্ষা-বিভাগের নতুন হর্তা-কর্তা।

ময়েট সাহেব ছুটি নিয়ে বিলেতে চলে গিয়েছেন। শিক্ষা-সমিতি উঠে গিয়ে হয়েছে ডাইরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকসন্। ইয়ং সাহেব বাংলাদেশের প্রথম ডি. পি. আই. হয়ে এলেন। ছ'সাত বছর ধরে বিদ্যাসাগর যেরকম যোগ্যতার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের কাজ ও চারটে জেলার ইনসপেক্টারের কাজ করছেন এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি যেরকম পরিশ্রম করেছেন তাতে সকলেই আশা করেছিল যে, তিনিই ঐ নতুন পদটা পাবেন। কিন্তু যিনি নতুন ডি. পি. আই. হয়ে এলেন, তিনি বয়সে যেমন বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক ছোট, শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাও তেমনি কম। অথচ তাঁরই অধীনে বিদ্যাসাগরকে চাকরী করতে হবে। পণ্ডিত ইংরেজের এই অবিচারে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তবে মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না।

এই ইয়ং সাহেবের সঙ্গে ক্রমে নানা বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের মন কষাকষি হতে লাগলো। ইয়ং সাহেবও এই বামুন পণ্ডিতের তেজস্বিতা আর স্বাধীন-চিত্ততার জন্যে তাঁর উপর গোড়া থেকেই একটু বিরূপ ছিলেন। হ্যালিডে সাহেবকে বিদ্যাসাগর একদিন বললেন—"এতবড় একটা পদে একজন বয়স্ক লোক নিযুক্ত করলে ভালো হতো।"

"কেন পণ্ডিত, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?"—জিজ্ঞাসা করেন ছোটলাট।

"না, আমার অসুবিধা এখনো হয় নি, তবে বলছিলাম কি—"

"বুঝতে পেরেছি। তা দেখুন আমি নিজেই সব করবো, মিষ্টার ইয়ং উপলক্ষ মাত্র। তবে আপনি মাঝে মাঝে ওঁকে একটু কাজ বুঝিয়ে দেবেন।"

ছোটলাটের কথামতো বিদ্যাসাগর ইয়ং সাহেবের কাছে

আফিসে গিয়ে তাঁকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু ক্রমে নানা বিষয়ে, বিশেষ করে জেলায় জেলায় অসংখ্য স্কুল খোলার ব্যাপারে ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হতে লাগলো। তখন বিদ্যাসাগর ছাড়া আরো দুজন ইংরেজ ইন্‌সপেক্টার ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন—"এখন থেকে একটু বিবেচনা করে নতুন স্কুল খুলবেন।"

"আপনি কি মনে করেন আমি বিবেচনা না করেই এতদিন এ-কাজ করছি ?"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর।

"না, সেকথা বলছি না। তবে কিনা বড় বেশী টাকা খরচ হচ্ছে। এত টাকা দেবো কোথা থেকে ?"

"কেন, ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা তো এ-দেশের শিক্ষা বিভাগের জন্যে কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন !"

"তা আমি জানি। কিন্তু একটু হিসেব করে কাজ করতে হবে তো। আমি বলছি, এখন নতুন স্কুল স্থাপন কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকুক।"

বিদ্যাসাগর আর তর্ক করলেন না।

হ্যালিডে সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে, এইরকম বিধি নিষেধ মেনে তাঁর পক্ষে সাধারণভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। এখানেও শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জয় হলো। বিলেতের কর্তৃপক্ষ ছোটলাটকে লিখে পাঠালেন যে, বিদ্যাসাগর তাঁর ইচ্ছা মতো স্কুল খুলতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। এবার বিদ্যাসাগর দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুল খুলতে লাগলেন। ইয়ং সাহেব তো রেগে আগুন। বিদ্যাসাগরের ওপর তিনি ভীষণ বিরূপ হলেন। স্বয়ং ছোটলাট তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন ! ইয়ং সাহেবের বিরোধিতা উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে কতকগুলো বৃত্তি ছিল। খরচ বেশী হচ্ছে, এই ওজুহাতে ইয়ং সাহেব ঐ

বৃত্তিগুলো বন্ধ করে দিলেন। ঠিক এই সময় নতুন ইংরেজী ক্লাসের জন্যে পৃথক ঘর দরকার এবং হিন্দু কলেজের দুখানা ঘর খালি ছিল সংবাদ পেলেন। অমনি বিদ্যাসাগর ঐ ঘর দুখানা সংস্কৃত কলেজকে দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করতে ইয়ং সাহেবকে অনুরোধ করলেন। ইয়ং সাহেব বললেন—"আপনি নিজে গিয়ে সাট্‌ক্লিফ সাহেবকে বলুন।"

সাট্‌ক্লিফ হিন্দু কলেজের তখন প্রিন্সিপাল।

এর আগে থেকেই ঘর নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য ঘটেছিল। তাই বিদ্যাসাগর বললেন—"আপনি হিন্দু কলেজের সাট্‌ক্লিফের কাছে গিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালে তবে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। কিন্তু আমি একলা যেতে পারবো না এর জন্যে।"

ইয়ং সাহেব রাজী হলেন না।

এই সময়ে (১৮৫৭, জনুয়ারী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। উনচল্লিশ জন বিশিষ্ট লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সদস্য নিযুক্ত হলেন। ঐ সদস্যদের মধ্যে ছয়জন দেশী সভ্য ছিলেন। এই ছয়জনের মধ্যে বিদ্যাসাগর একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কনভোকেশনে সভাপতি ছিলের গভর্ণর-জেনারেল। সেদিন তাঁর পাশেই বিদ্যাসাগরের আসন দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক সমিতিতে হিন্দী, বাংলা, সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। পরে তিনি বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষারও পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই সেদিন তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো কাজই হতো না।

আরো এক বছর কেটে গেল।

ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মন কষাকষি ক্রমেই বেড়ে চললো। এই সময়ে ইয়ং সাহেব তাঁর ওপরে নিয়ম করতে চাইলেন যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের আরো বেশী করে মাইনে দিতে হবে। এতে বিদ্যাসাগর আপত্তি করলেন। বললেন—"ছেলেরা গরীব। বেশী মাইনে কোথা থেকে দেবে ?"

কিন্তু এবারে শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তি টিকলো না।

বিরক্ত হয়ে তিনি চাকরী ছেড়ে দিলেন।

পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী, আর সেই সঙ্গে এত বড় পদ বিদ্যাসাগর এক কথায় ছেড়ে দিলেন। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব কত বোঝালেন, বন্ধুরা কত উপদেশ দিলেন, আত্মীয়েরা এসে কতরকমে বাধা দিলেন—কিন্তু বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ।

"বিদ্যাসাগর, তুমি কাজটা ভালো করলে না!"—বললেন একজন হিতৈষী সহকারী।

"টাকার চেয়ে আমার কাছে ইজ্জৎ বেশী। পদমর্যাদার চেয়ে সম্ভ্রম বড়।"

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—কিছুতেই টললো না।

বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর।

মাথার ওপর কত বড় সংসার, কতকগুলো মাসিক মাসোহরা দিতে হতো তাঁকে, বুড়ো বাপ-মা এবং সকলের ওপর তাঁর সমাজ-সংস্কারের ব্রত—এতগুলো দায়িত্ব ছিল বিদ্যাসাগরের মাথায় উপর সেই সময়। সবচেয়ে বেশী ভাববার বিষয় ছিল সমাজ-সংস্কারের জন্য বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্প্রতি তিনি শুরু করেছিলেন তখন, তার খরচ তো বড় কম ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই দমলেন না। চিরকাল তিনি ছিলেন অত্মনির্ভরশীল, চিরকালই তিনি নির্ভীক। যা ভালো বুঝতেন, তাই করতেন—সেই এঁড়ে বাছুরের জেদ।

সমস্ত বাংলা দেশ তাঁর এই জেদ দেখে সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল।